১৪ নভেম্বর ১৯৯০ □ আনন্দবাজার প্রকাশন □ সাত টাকা

□ ডেভিস কাপ ফাইনালে আমেরিকা-অস্ট্রেলিয়া লড়াই আসন্ন
□ শতাব্দীর সেরা দাবার লড়াই
□ সেরা ফাস্ট বোলার ওয়াসিম আক্রম

□ জন লেননের পঞ্চাশ বছর
□ যেন জীবন্ত শার্লক হোমস
□ মানসিক প্রতিবন্ধকতার পাঠক্রম

আনন্দমেলা

নস্ট্রাডামুসের অবিশ্বাস্য ভবিষ্যদ্বাণী

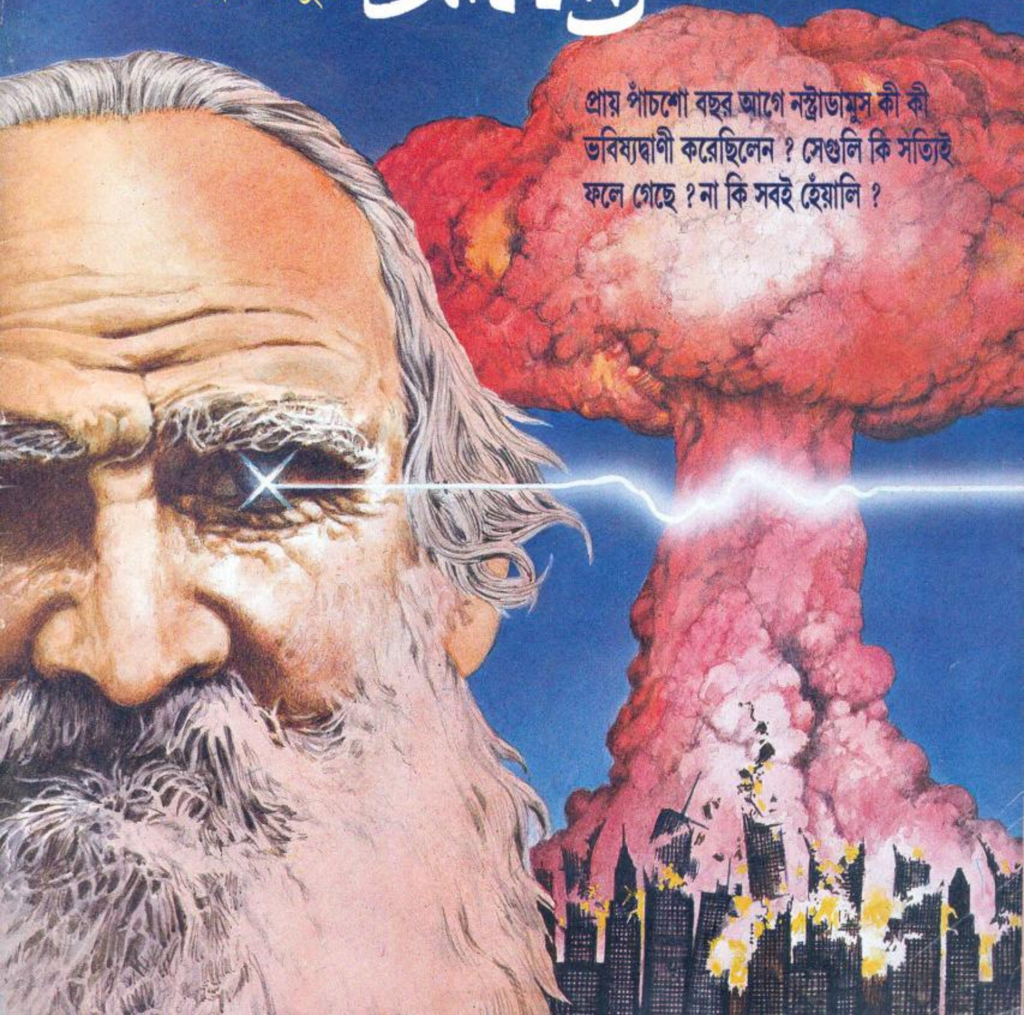

প্রায় পাঁচশো বছর আগে নস্ট্রাডামুস কী কী ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন ? সেগুলি কি সত্যিই ফলে গেছে ? না কি সবই হেঁয়ালি ?

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি দিয়েছেন - নীলাচল দা

স্ক্যান করেছেন - নীলাচল দা

এডিট করেছেন - অপ্তিমাস

একটি আবেদন

আপনাদের কারোর কাছে যদি কোন পত্রপত্রিকার বিশেষ সংখ্যা থাকে এবং আপনি সেটা আমাদের স্ক্যান করতে দিতে চান কিংবা আপনি স্ক্যান করে দিতে চান তাহলে শীঘ্রই নিচের ইমেল এ যোগাযোগ করুন

dhulokhela@gmail.com

optifmcybertron@gmail.com

Amul
MILK CHOCOLATE
বদমাইস মোটকার জন্যে
Amul
CRISP
MILK CHOCOLATE
ঘ্যানঘেনে পিংকির জন্যে
Amul
FRUIT & NUT
MILK CHOCOLATE
শয়তান ছোটকার জন্যে
Amul
MILK CHOCOLATE
ORANGE
FLAVOURED
আমার সবচেয়ে আদরের প্রীতির জন্যে
Amul
Badambar
চামচা চিন্টুর জন্যে
Amul
CRUNCH
MILK CHOCOLATE
আমার টীচারের জন্যে
Amul
ORANGE
Amul
CRIS
Amul
MILK CHOCOLATE
এসবই আমারই আমার জন্যে
বিক্রী ব্যবস্থায় :
গুজরাট কো-অপারেটিভ
মিল্ক মার্কেটিং
ফেডারেশন লিঃ
আমূল চকোলেট — তোমার ভালোবাসার পাত্রের জন্যে সেরা উপহার !
RADEUS/AMC/036/90-BEN

২৭ কার্তিক ১৩৯৭ □ ১৪ নভেম্বর ১৯৯০ □ ১৬ বর্ষ ১৫ সংখ্যা

আনন্দমেলা

■ সম্পূর্ণ উপন্যাস (প্রথমাংশ) ■

খোঁজা লীলা মজুমদার ৫৪

■ গল্প ■

সেদিন সকালে শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায় ২৬

দুই বোন শিবতোষ ঘোষ ৩৬

■ ধারাবাহিক উপন্যাস ■

কালাপাহাড় সমরেশ মজুমদার ২৩

সোনার গণপতি হিরের চোখ ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায় ৭৫

■ প্রচ্ছদকাহিনী ■

নস্ট্রাডামুসের অবিশ্বাস্য ভবিষ্যদ্বাণী অভীক মজুমদার ১২

■ বাইরের জানালা ■

যেন জীবন্ত শার্লক হোমস শিশির কর ৬

■ বিশ্ববিচিত্রা ■

জন লেননের পঞ্চাশ বছর বিকাশ চক্রবর্তী ৩২

■ কমিক্‌স ■

টারজান ৩১, রোভার্সের রয় ৫১, গাবলু ৫৩, টিনটিন ৭১, ব্যাটম্যান ৭৩

■ টাকাকড়ি ■

প্রাক-মৌর্য ভারতের ··· ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৬৮

■ কেরিয়ার গাইড ■

মানসিক প্রতিবন্ধকতার পাঠক্রম অমর দাশ ৬৬

■ কবিতা ■

রহস্য-সন্ধানী অনিমেষ বসু ৩০

■ খেলাধুলো ■

আক্রম এখন সেরা ফাস্ট বোলার সমীরণ সেন ৪০

ডেভিস কাপ ফাইনালে ··· অনির্বাণ দত্ত ৪৪

শতাব্দীর সেরা দাবার লড়াই সব্যসাচী সরকার ৪৬

খেলার খবর ৪৮

সেই বর্গ কি আর ··· সুজিত রায় ৪৯

রঙিন পোস্টার : সার রিচার্ড হ্যাডলি ও শচীন তেণ্ডুলকর ৪২

■ নিয়মিত বিভাগ ■

চিঠিচাপাটি ৫, বিজ্ঞান : যেখানে যা হচ্ছে ১০, কিওকুশিন ক্যারাটের ক্লাস ৫০, আকাশে ওড়ার কথা ৬২, শব্দসন্ধান ৬৩, ক্যাম্পাস ৭০, আঁকিবুকি ৭৬, হাসিখুশি ৭৬, কুইজ ৭৮, বইয়ের খবর ৮১, নানারকম ৮২

■ প্রচ্ছদ ■

বিমল দাস

সহকারী সম্পাদক □ দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদকীয় বিভাগ □ সিদ্ধেশ্বরনাথ ভার্মা, সাধনা মুখোপাধ্যায়, শ্যামলকান্তি দাশ, রতনচন্দ্র ঘাটী, বাদলকুমার ঘোষ, বিমলকুমার পাল

শিল্প নির্দেশক □ অমিয় ভট্টাচার্য

সহযোগী □ অসিত পাল, প্রবীর সেন

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের পক্ষে বিজিৎকুমার বসু কর্তৃক ৬ ও ৯ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। অস্থায়ী সম্পাদক অভীক সরকার। দাম সাত টাকা। বিমান মাশুল ত্রিপুরা ২০ পয়সা উত্তর পূর্ব ভারত ৩০ পয়সা

১২

বিজ্ঞানের যুগে কোনও ভবিষ্যদ্বাণীতেই সায় দেন না যুক্তিবাদী মানুষ। যুক্তি ও প্রমাণ ছাড়া কোনও কিছু বিশ্বাস করাও ঠিক নয়। কয়েক শতাব্দী আগে নস্ট্রাডামুস কিছু ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন, যা নিয়ে বিতর্ক ও আলোচনা হয়েছে নানা সময়ে। হেঁয়ালির ভাষায় লেখা ভবিষ্যদ্বাণীর পরিপ্রেক্ষিতে নানাজন নানাভাবে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন বিংশ শতাব্দীর ঘটনাবলী। নস্ট্রাডামুস জন্মেছিলেন ফ্রান্সের সেন্ট রেমি ডে প্রভিন্স-এ, ১৫০৩ খ্রিস্টাব্দে। তারপর বেশ কয়েকটি শতাব্দী কেটে গেছে। নস্ট্রাডামুস ও তাঁর অবিশ্বাস্য ভবিষ্যদ্বাণীগুলি নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে এবারের প্রচ্ছদকাহিনীতে।

৩২

ষাটের দশকে গান গেয়ে সমস্ত পৃথিবীকে মাতিয়ে তুলেছিলেন জন লেনন। লিভারপুলের এই যুবক তখন তরুণসমাজের কাছে বিশাল এক ব্যক্তিত্ব। গানের মাধ্যমে তিনি জাগিয়ে তুলেছেন নতুন পৃথিবীর স্বপ্ন। বেঁচে থাকলে এ-বছরেই পালিত হত তাঁর পঞ্চাশতম জন্মদিন। জন লেননকে নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে একটি নিবন্ধে।

৪৬

ফুটবল বা ক্রিকেট খেলা দেখতে হাজার হাজার মানুষ ভিড় করেন স্টেডিয়ামে। কিন্তু বিশ্ব-দাবার খেতাবি লড়াই নিয়ে সারা বিশ্বে যে কৌতূহলের সৃষ্টি হয়েছে, তা কোনওভাবেই ফুটবল বা ক্রিকেটের প্রতি সাধারণ মানুষের আগ্রহের চেয়ে কম নয়। কাসপারভ ও করপোভের মধ্যে চলছে এই লড়াই। শেষ পর্যন্ত কে জেতেন, তা জানার জন্য এখনও আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। বিশেষজ্ঞরা অবশ্য ইতিমধ্যেই এই লড়াইকে শতাব্দীর সেরা দাবার লড়াই হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

■ আগামী সংখ্যায় ■

সুপ্রতিম সরকারের প্রচ্ছদকাহিনী

দুঃসাহসিক অন্তর্ধান

লীলা মজুমদারের সম্পূর্ণ উপন্যাস (শেষাংশ)

খোঁজা

আশাপূর্ণা দেবীর গল্প

হিতৈষী

কৌশিক মুখোপাধ্যায়ের প্রযুক্তিবিজ্ঞান

গতি-প্রযুক্তির নেপথ্যে

আজ্ঞে হ্যাঁ, সঠিক খাবার না খেলে বাচ্চার বাড়-বাড়ন্তে বাধা আসে...

যে বাচ্চা ঠিকমত খায় না, সে তার শরীরের প্রয়োজনমত পুষ্টি পুরোপুরি পায় না। আর পর্যাপ্ত পুষ্টির অভাবে বাচ্চার বাড়-বাড়ন্তে বাধা আসতে পারে। ওকে দিন কমপ্লান, যা হারানো পুষ্টি ফিরে পেতে ওকে সাহায্য করে। কমপ্লানে রয়েছে দুধ প্রোটিন (২০%) – তার বাড়-বাড়ন্তের জন্যে সবচেয়ে সেরা প্রোটিন। তাছাড়া, অন্যান্য ২২ রকমের খাদ্যগুণও যা তার শরীরের জন্যে একান্ত প্রয়োজন!

কমপ্লান – ৫টি মজাদার
স্বাদগন্ধে পাওয়া যায়

কমপ্লান
সুপরিকল্পিত সম্পূর্ণ আহার

GX 27/244 BEN

চিঠিচাপাটি

ম্যাজিক, ম্যাজিক সংখ্যাটি সংগ্রহযোগ্য

'ম্যাজিক, ম্যাজিক' প্রচ্ছদকাহিনীটি পড়লাম। লেখাটি পড়ে বিভিন্ন দেশের ম্যাজিক ও ম্যাজিশিয়ানদের সম্পর্কে অনেক তথ্য জানতে পারলাম। কিন্তু বিখ্যাত জাদুকর ম্যাসকেলাইন ও ডেভিড ডেভান্ট এবং ফরাসি জাদুকর রোবেয়র সম্পর্কে কোনও উল্লেখ নেই দেখে অবাক হলাম। জাদুকর পি· সি· সরকার (জুনিয়ার)-এর সাক্ষাৎকারটি পড়ে খুব ভাল লাগল।

দেবজিৎ সেনগুপ্ত
কৃষ্ণজিৎ সেনগুপ্ত
বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ

২২ অগস্ট ম্যাজিক, ম্যাজিক লেখাটি পড়ে খুব ভাল লাগল। দেশের ও বিদেশের অনেক জাদুকর সম্পর্কে বহু তথ্য জানতে পারলাম। কিন্তু আপনারা যদি একটি ম্যাজিক শেখাতেন, খুব ভাল হত। আগামী কোনও সংখ্যায় যদি সাধারণ ম্যাজিকের কৌশল নিয়ে লেখা ছাপেন, দারুণ হয়।

শশিভূষণ সাহা
পাণ্ডুয়া, হুগলি,
মায়া, মিঠু ও মালতী প্রামাণিক
জয়নগর, ২৪ পরগনা
সন্দীপ রায়
মির্জাপুর, বাঁকুড়া

'ম্যাজিক, ম্যাজিক' প্রচ্ছদকাহিনীটি ২২ অগস্ট সংখ্যায় পড়লাম। সত্যি এই সংখ্যাটি এক অনন্য উপহার পাঠকদের কাছে। এই সংখ্যাটি পড়ে ম্যাজিক সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানতে পারলাম। বলতে গেলে ম্যাজিক সম্বন্ধে আমরা ছিলাম একেবারে অজ্ঞ। জাদুসম্রাট জুনিয়ার পি· সি· সরকারের সাক্ষাৎকার এই সংখ্যাটিকে আরও আকর্ষক করেছে। এইজন্য আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

মণীশ, খোকন সরকার
ধ্রুব চক্রবর্তী
বিদ্যাপীঠ রোড, শিলিগুড়ি-১

ম্যাজিক-সংক্রান্ত সংখ্যাটি পাঠক-পাঠিকাদের উপহার দেওয়ার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ। ম্যাজিক-সংক্রান্ত নানা তথ্য ও ছবিতে ভরা এই সংখ্যাটি সত্যিই দুর্মূল্য এবং সংগ্রহ করে রাখার মতো।

আমি একজন জাদুবিদ্যা-অনুরাগী এবং বর্তমানে জাদু-শিক্ষার্থী। তাই ম্যাজিক নিয়ে আমার কৌতূহলের শেষ নেই। ম্যাজিক হচ্ছে এমনই এক সূক্ষ্ম শিল্পকলা, যার কোনও তুলনা হয় না। 'ম্যাজিক' ও 'জাদুবিদ্যা' কথা দুটির মধ্যে পার্থক্য থাকলেও (প্রাচ্যে এই বিদ্যা জাদুবিদ্যা নামে পরিচিত এবং তা আয়ত্ত করতে গেলে নিয়মিত সাধনা, সংযম ইত্যাদি দরকার, কিন্তু পাশ্চাত্যের জাদুবিদ্যা যে কেউ মাত্র কয়েকদিনের অভ্যাসে দেখাতে পারেন, কারণ তার অধিকাংশই যন্ত্রকৌশল-সংবলিত।) বর্তমানে দুটোকে একই অর্থে ব্যবহার করা হয়। এর অন্য নাম ইন্দ্রজাল, মায়াজাল, ভোজবাজি, ভানুমতীর খেলা ইত্যাদি। এইসব নামের পেছনে নানা কিংবদন্তি বা গল্পও শোনা যায়। দেবরাজ ইন্দ্রের রাজসভায় এই বিদ্যার নিয়মিত প্রদর্শন হত, এজন্য নাম 'ইন্দ্রজাল' হলেও আর-একটি কারণও বলা হয়, তা হচ্ছে ইন্দ্রিয়ের শ্রেষ্ঠ চক্ষুর ওপর জাল বিস্তার করে এই বিদ্যা প্রদর্শিত হয়, তাই নাম ইন্দ্রিয়জাল বা ইন্দ্রজাল। প্রমার বংশীয় রাজা ভোজ জাদুবিদ্যায় অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন এবং তাঁর কন্যা ভানুমতীও এই বিদ্যায় অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন, বরং বলা যায় পিতার থেকেও বেশি। তাঁদের নামানুসারে এর নাম বলা হয় ভোজবাজি বা ভানুমতীর খেলা। ভুজ বা হাতের সাহায্যে যেহেতু প্রদর্শিত হয়, তাই এই বাজি বা খেলাকে ভোজবাজি এবং 'ভান' ও 'মতি' অর্থাৎ মতি বা মনের বিভ্রম ঘটিয়ে চোখে ধাঁধার সৃষ্টি করা হয়, তাই 'ভানমতি কা খেল' বা 'ভানুমতীর খেলা', এদের এই দুটো ভিন্ন কারণও দেখানো হয়।

আমরা গর্বের সঙ্গে বলতে পারি যে, ভারত তথা বাংলার এটি একটি অতি প্রাচীন ও নিজস্ব খেলা। এমন একটা সময় ছিল, যখন বাংলার ঘরে-ঘরে এটি একটি অতি জনপ্রিয় ও চর্চার বিষয়বস্তু ছিল। বাঙালি জাদুকররাই চিরকাল দেশে-বিদেশে জাদুর খেলা দেখিয়ে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছেন এবং বাঙালিদের নিজস্বতা দেখিয়ে সারা পৃথিবীতে হইচই ফেলে দিয়েছেন। আধুনিক জাদুবিদ্যার জনক গণপতি চক্রবর্তী, জাদুসম্রাট পি· সি· সরকার দ্বারা আবিষ্কৃত সমস্ত খেলা আজ বিশ্বের জাদুসমাজ দেখিয়ে থাকেন।

অদ্রীশ বিশ্বাসের তথ্যপূর্ণ প্রচ্ছদকাহিনী এবং ভারতীয় জাদুকরদের সম্বন্ধে তথ্যপূর্ণ লেখা পড়ে খুব ভাল লাগল, লিখেছেন দীপক রায়। পি· সি· সরকার (জুনিয়ার)-এর সাক্ষাৎকারটি নেওয়ার জন্য স্বপ্নাতীত সরকারকে ধন্যবাদ জানাই। তবে পি· সি· সরকার বা জুনিয়ারের বড় রঙিন ফোটো ছাপালে আরও ভাল লাগত।

অভিজিৎ ঘোষ
শ্যামবাজার, কলকাতা-৪

২২ অগস্ট সংখ্যায় ম্যাজিক, ম্যাজিক প্রচ্ছদকাহিনীটি পড়লাম। ভারত-সহ বিশ্বজাদুকরদের বিশেষ-বিশেষ ছবিসহ কাহিনী ভাল লেগেছে।

পি· সি· সরকার (জুনিয়ার)-এর 'ইন্দ্রজাল' কলকাতায় দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। "ম্যাজিক মানে কী ?" তাঁর সাক্ষাৎকারের বিবরণটি পড়ে অনেক কিছু জানলাম।

অনিমেষ দাস, নালিকুল, হুগলি

যেন জীবন্ত শার্লক হোমস

গোয়েন্দা-কাহিনীর শার্লক হোমস যেন এখনও জীবন্ত হয়ে আছেন ! টরোন্টোর কোনান ডয়েল সংগ্রহশালা ঘুরে এসে লিখেছেন **শিশির কর**

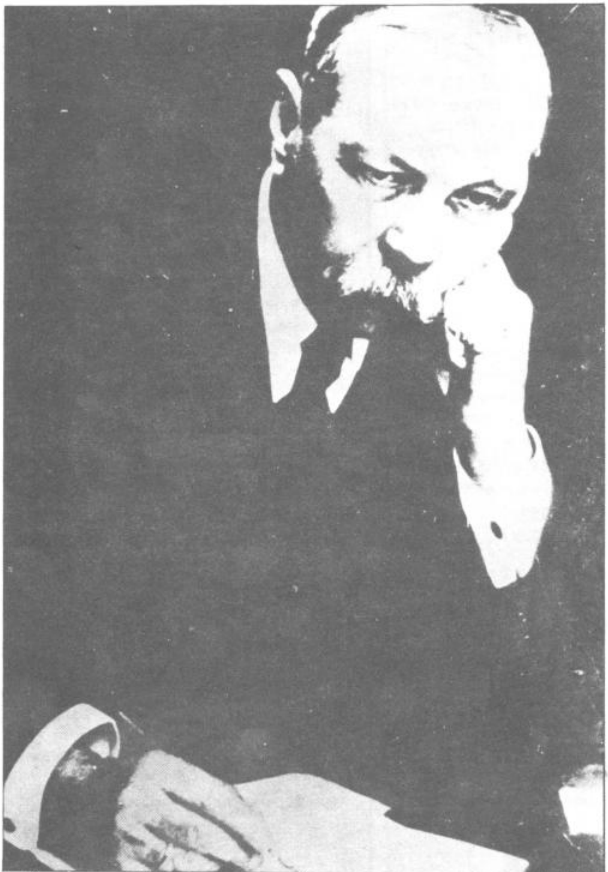

শার্লক হোমস-এর কাহিনী লেখায় ব্যস্ত সার আর্থার কোনান ডয়েল

কানাডার টরোন্টোয় যেন জীবন্ত শার্লক হোমসের দেখা মিলল । ওখানকার মেট্রোপলিটন লাইব্রেরিতে ঢুকলে মনে হবে রক্তমাংসের শার্লক হোমস বিরাজ করছেন । শার্লক হোমসের সেই সুপরিচিত পূর্ণাবয়ব ছবিটি দেখে মনে হবে, যেন জীবন্ত শার্লক সামনে দাঁড়িয়ে আছেন । মাথায় সেই টুপি, মুখে পাইপ, গায়ে সেই প্যান্ট-শার্ট । জটিল অপরাধের রহস্যভেদের জন্য গভীর চিন্তায় নিমগ্ন । তাঁর সেই সুপরিচিত মুখ, যা ঈষৎ ঝুঁকে আছে মাটির দিকে । টরোন্টোয় ৭৪৯ নম্বর ইয়ং স্ট্রিটের বিরাট অট্টালিকায় মেট্রোপলিটন টরোন্টো লাইব্রেরির ছ' তলায় সাহিত্য বিভাগের বিশেষ আকর্ষণ আর্থার কোনান ডয়েল সংগ্রহশালাটি । এখানেই দেখা পাওয়া যাবে এই জীবন্ত শার্লক হোমসের । ডয়েলের শার্লক সিরিজের একাধিক গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি সযত্নে রক্ষিত আছে । দ্বিতীয় পর্যায়ে শার্লক সিরিজের প্রথম বই 'দ্য রিটার্ন অব শার্লক হোমস'-এর পাণ্ডুলিপিও সেখানে আছে । আরও আছে ডয়েলের বহু গ্রন্থ ও রচনার পাণ্ডুলিপি । লন্ডনের যে বিখ্যাত 'স্ট্র্যান্ড' পত্রিকায় তাঁর শার্লক হোমসের কাহিনী ও অন্যান্য লেখা ধারাবাহিকভাবে বের হত সেই পত্রিকার সম্পাদককে লেখা বহু চিঠি এখানে আছে । বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত শার্লক হোমসের অনেকগুলি সংস্করণও সমৃদ্ধ করেছে এই সংগ্রহশালাকে । শার্লক হোমসের ব্যবহৃত কিছু জিনিসপত্রও এখানে দেখানো হয়েছে ।

সার আর্থার কোনান ডয়েলের সঙ্গে কানাডার সম্পর্ক নিবিড় । সে-কথা মনে রেখেই টরোন্টোয় বিশ্বের অন্যতম গোয়েন্দা-কাহিনী শার্লক হোমস সিরিজের লেখকের এই সংগ্রহশালাটি গড়ে তোলা হয়েছে । ডয়েল অন্তত তিনবার কানাডায় এসেছিলেন— ১৮৯৪, ১৯১৪ এবং ১৯২২-২৩ । বিশেষ করে ১৯২২-২৩ সালে তিনি কানাডার বিভিন্ন শহরে সাম্রাজ্যবাদ ও অধ্যাত্মবাদ সম্পর্কে ভাষণ দিয়েছিলেন । ডয়েলের লেখাতেও আছে কানাডার কথা— 'দ্য হাউন্ড অব দ্য বাস্কারভিলস' (১৯০২), 'দ্য ক্যানন'। কানাডার শার্লকপ্রেমীরা এখন এখানে একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা বের করেন । কানাডার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে— হ্যালিফক্স থেকে ভ্যান্কুভার পর্যন্ত দশটি শহরে এর অসংখ্য গ্রাহক । ডয়েল ছাড়া কানাডার পটভূমিতে শার্লক হোমসকে নিয়ে অন্য লেখকের কাহিনীও আছে । একটি গল্পে নবগঠিত ডোমিনিয়নের বিরুদ্ধে চক্রান্ত বানচাল করতে কানাডার প্রধানমন্ত্রী সার জন ম্যাকডোনাল্ড জরুরি বার্তা পাঠান শার্লককে । শার্লক তাঁর সঙ্গী ওয়াটসনকে নিয়ে অটোয়া ও টরোন্টোয়

আসেন। ষড়যন্ত্রের হাত থেকে রক্ষা করেন কানাডাকে। গল্পটির নাম : দ্য অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য অ্যানেক্সেসানিস্ট কনস্পিরেসি। ডয়েলের শার্লক সিরিজ নিয়ে কানাডায় একাধিক ফিল্ম, থিয়েটারও হয়েছে। 'দ্য স্কারলেট ক্ল'-তে শার্লকের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন বেসিল রথবন এবং ওয়াটসনের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন নিগেল ব্রুস। এই চলচ্চিত্র তৈরি হয় ১৯৪৪ সালে। আরও পরে ১৯৭৯ সালে শার্লককে নিয়ে নির্মিত হয় 'মার্ডার বাই ডিগ্রি' ছবিটি। এখানে শার্লক ও ডাঃ ওয়াটসনের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন যথাক্রমে শিল্পী ক্রিস্টোফার প্রামার ও জেমস ম্যাসন। ডয়েলের বাসস্থান 'বেকার স্ট্রিট' নামে একটা গানের রেকর্ডও বের হয় ১৯৬৫ সালে। কানাডার তিন সঙ্গীতশিল্পী গানগুলি গেয়েছেন। তাঁরা হলেন : মেরিয়ান ব্রুডেফ, রেমন্ড জেসেল ও জেরোম কুপারস্মিথ। এখানে শার্লকের উদ্দেশে বলা হয়েছে :

ইউ মাস্ট ডাই, ডিয়ার হোমস
ইয়েট অ্যাজ ব্রেথ অ্যান্ড সিমস
আই শ্যাল মোর্ন,
অ্যাজ আই হ্যাভ নেভার মোর্নড বিফোর।
হোয়েন দ্য স্টেটলি হোমস অব ইংল্যান্ড
ইজ নো মোর।।

টরোন্টোর এই লাইব্রেরিতে আছে অতুলনীয় এক শার্লক হোমস সংগ্রহ

শার্লককে নিয়ে ১৯৭৮ সালে 'দ্য ইনক্রেডিবেল মার্ডার অব কার্ডিয়াল টোস্কা' নামে একটি থিয়েটারও হয় কানাডায়। তিন অঙ্কের এই কমেডি-মিস্ট্রির লেখক হলেন কবি অ্যানডেন নাউলন এবং থিয়েটার-ডিরেক্টর হলেন ওয়াল্টার লার্নিং। সমালোচকদের মতে, 'উত্তেজনায় ভরা এই থিয়েটারটি বৈচিত্র্যময় ও আনন্দদায়ক।' কানাডার লেখক এল বি গ্রিনউড শার্লককে নিয়ে তিনটি উপন্যাসও লেখেন : শার্লক হোমস অ্যান্ড দ্য কেস অব দ্য র‍্যালি লিগাসি (১৯৮৬), শার্লক হোমস অ্যান্ড দ্য কেস অব দ্য সাব্রিনা হল (১৯৮৮) এবং শার্লক হোমস অ্যান্ড দ্য থিসটেল অব স্কটল্যান্ড (১৯৮৯)। রোনাল্ড সি ওয়েম্যান এই বছরেই লেখেন, "শার্লক হোমস অ্যান্ড দ্য মার্ক অব দ্য বিস্ট"। ক্রিস্টোফার রেডসন্স ১৯৮৭ সালে লেখেন 'ওয়েলকাম টু আমেরিকা, মিঃ শার্লক হোমস'। অনেকে মনে করেন, বিশ্বের শার্লক

টালাও বাংলা বই, ক্যাসেট

টরোন্টোর পাতাল রেলের ইয়ং স্টেশনে নেমে এস্কালেটরে ওপরে ওঠে একটু হাঁটার পরই পেয়ে গেলাম ৭৮৯ ইয়ং স্ট্রিটের সুবিশাল ও সুদৃশ্য ভবনটি, মেট্রোপলিটন টরোন্টো রেফারেন্স লাইব্রেরি। একতলায় অনুসন্ধান করে গেলাম লাঙ্গুয়েজেস অ্যান্ড লিটারেচার ডিপার্টমেন্টের সিনিয়র কালেকশনস লাইব্রেরিয়ান শ্রীমতী বারবারা গুস্থার-এর কাছে। বারবারাকে খুব ব্যস্ত দেখাচ্ছিল। তবু ধৈর্যের সঙ্গে আমার প্রশ্নের জবাব দিলেন। ওঁর কাছ থেকেই জানলাম, এই লাইব্রেরিতে বিশ্বের ১০০ ভাষার বইপত্র আছে। বাংলা বইও আছে হাজারখানেকের বেশি। দুই বাংলারই প্রখ্যাত লেখকদের বই আছে। চিত্রকলা, সঙ্গীতের সংগ্রহও উল্লেখযোগ্য। কী-কী বংলা বই আছে জানতে চাইলাম। উনি সামনের কম্পিউটারটি দেখিয়ে দিলেন। ওঁর পরামর্শমতো আমি কম্পিউটারের বোতাম টিপে 'বেঙ্গলি' লিখলাম। একের পর এক বাংলা বইয়ের নাম ভেসে উঠল পরদায়। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্রের বইয়ের সঙ্গে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সেই সময়' ও 'মন ভালো নেই', দিব্যেন্দু পালিতের 'বিনিদ্র' এবং শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের বইও। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সমরেশ বসুরও একাধিক বই আছে। দুই বাংলার সমালোচনা গ্রন্থও চোখে পড়ল। যেমন, চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'আনন্দমঠ'। বারবারা জানালেন, এই লাইব্রেরিতে বইয়ের কোনও খাতাপত্র, ক্যাটালগ, বা ইনডেক্স নেই। সব বইয়ের নাম কম্পিউটারের মেমরিতে। তবে প্রতিবন্ধীদের জন্য পৃথক বিভাগ আছে। অন্যসব বিভাগে পাঠকদেরই কম্পিউটারের বোতাম টিপে নিজেদের বই খুঁজে নিতে হয়। খবরের কাগজ ও পত্রপত্রিকা বিভাগে গিয়ে দেখলাম, টেবিলে আনন্দবাজার পত্রিকা, দেশ, বিচিত্রা পড়ছেন দুই বাঙালি।

এখানে শুধু বংলা বই, পত্রপত্রিকাই নেই, এর অডিও-ভিসুয়াল বিভাগে আছে বাংলা সিনেমা, বাংলা গানের রেকর্ড ও ক্যাসেট— দুইই। কানে হেডফোন দিয়ে পরদায় দেখলাম 'অরণ্যের দিনরাত্রি'। ক্যাসেটে শুনলাম 'শেষের কবিতা'। নজরুলগীতি, রবীন্দ্রসঙ্গীত, শ্যামাসঙ্গীত, কীর্তন, আধুনিক বাংলা গানের রেকর্ডও আছে। তা ছাড়া এদের 'ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড লিটারেচার অডিও সার্ভিস'-এ বাংলা শেখার ব্যবস্থাও আছে।

দুধের চমৎকার
দুধে যা যা তৈরী হয়
মিনিট মিল্ক
আরো ভালো বানায়
আরো ভালো, কারণ মিনিট মিল্ক দিনের ২৪ ঘন্টাই হাতের কাছে মজুত থাকছে।
আরো ভালো, কারণ মিনিট মিল্ক কত ঘন বা পাতলা হবে, তার ভার শুধু আপনার হাতেই থাকছে।
মিনিট মিল্ক দারুণ সব পায়েস বানায়।
আরো ভালো, কারণ যতখুশি কাপ চা বা কফি হোক না শেষ, মিনিট মিল্ক হতে চায় না নিঃশেষ।
আরো ভালো, কারণ মিনিট মিল্ক, খাঁটি, ঘন মালাইওলা, পুষ্টিগুণে ভরপুর।
... আর মিনিট মিল্ক দিয়ে তৈরী হয় দারুণ সব রসগোল্লা, সন্দেশ, খেতে সরেস।
মিনিট মিল্ক হল গ্ল্যাক্সো'র এক উৎকৃষ্ট উৎপাদন।
দুধ যেমনটি লাগে ভালো দিনে-রাতে যখনই বলো
MINIT MILK
MILK IN A MINUTE
2880

সংক্রান্ত সংগ্রহগুলির মধ্যে সেরা কানাডার মেট্রোপলিটন টরোন্টো রেফারেন্স লাইব্রেরির ২২১ নম্বর রুমে সার আর্থার কোনান ডয়েল কালেকশনটি। এই সংগ্রহশালার ভারপ্রাপ্ত ক্যামেরন হোলিয়ার সার আর্থার সম্পর্কে প্রচুর পড়াশোনা করেছেন। মন্ট্রিয়লে এ-বছরের ১৫ থেকে ১৭ জুন, ম্যাক গ্রিল বিশ্ববিদ্যালয়ে শার্লকপ্রেমীদের যে সম্মেলন হয়েছিল সেখানে ক্যামেরুন বক্তব্য রাখেন। বলা হয়েছিল, এটাই শার্লকপ্রেমীদের প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলন। সম্প্রতি টরোন্টোর হাইনস্লো প্রেস থেকে ছাপা জন রবার্ট কলম্বোর মিস্টিরিয়াস এনকাউন্টার্স পার্সোন্যাল অ্যাকাউন্ট অব দ্য সুপারন্যাচারাল ইন কানাডা' গ্রন্থে শার্লক ও ডয়েল সম্পর্কে অনেক তথ্য আছে।

কর্মব্যস্ত জীবন থেকে রেহাই পেতে শার্লক হোমসের রহস্য-রোমাঞ্চের জগতে ঢোকার পরিবেশও তৈরি করা হয়েছে ওই সংগ্রহশালাটিতে। ওখানে উজ্জ্বল আলো নেই, নেই অতি-আধুনিক আসবাবপত্র! সাজসরঞ্জাম, আসবাবপত্র, পোশাক-পরিচ্ছদ, এমনকী লেখার কলম, দোয়াতদানিটি পর্যন্ত ইংল্যান্ডের ভিক্টোরীয় যুগের। ফায়ারপ্লেসের পাশে শার্লকের সেই বাঁকানো পাইপ তামাক ভর্তি। তার পাশেই সেই মারাত্মক কোকেন নিডল, সেই পিস্তল। একটা ট্রেতে রাখা নানারকম ভিজিটিং কার্ড— সে যুগে যেসব বিশিষ্ট ব্যক্তি শার্লকের কাছে সাহায্যের জন্য আসতেন, তাঁদের। যেমন, মিস ভায়োলেট দামারভিল, সাসেক্স বিকিপারের সেই মধুর জারটিও বাদ যায়নি। আর্থার কোনান ডয়েলের এই সংগ্রহটি শুরু হয় ১৯৬৯ সালে, ১৫০টি বই দিয়ে। তারপর লন্ডনের মাটলেক সংগ্রহ থেকে বিভিন্ন জিনিসপত্র কিনে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে এই সংগ্রহশালা। টরোন্টোর জাজ এস টুপার বিগলো শার্লক হোমস সংক্রান্ত বইপত্রের বড় সংগ্রাহক এবং এ-বিষয়ে প্রচুর লিখেছেনও। ১৯৭০ সালে তাঁর সংগ্রহ এখানকার গৌরব বাড়ায়।

সংগ্রহশালার শার্লক হোমস কক্ষে আছে শার্লক হোমস সিরিজের নানা সংস্করণ। দেশে-দেশে বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত শার্লক হোমস গ্রন্থাবলী, শার্লক হোমস সম্পর্কিত আলোচনা ও সমালোচনার নানা

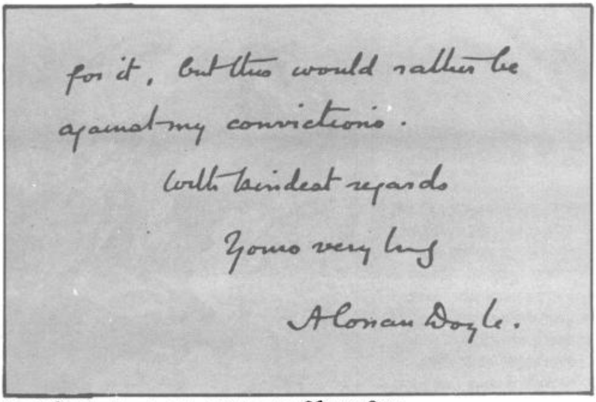
for it, but this would rather be against my convictions.
With kindest regards
Yours very truly
A. Conan Doyle.

স্ট্র্যান্ড পত্রিকার সম্পাদককে লেখা কোনান ডয়েলের চিঠির অংশবিশেষ

বই। এসবের মধ্যে উল্লেখ্য, ১৮৮৭ সালে প্রকাশিত 'এ স্টাডি ইন স্কারলেট' যেটি প্রথম প্রকাশিত হয় 'বিটলস ক্রিসমাস' অ্যানুয়ালে। ১৮৯০ সালে প্রকাশিত 'সাইন অব ফোর', যেটি প্রথম বের হয় 'লিপ্পিনকোটস' মাসিক পত্রিকায়, ১৮৯২ সালে প্রকাশিত 'দ্য অ্যাডভেঞ্চার অব শার্লক হোমস', 'দ্য মেমোয়ার্স অব শার্লক হোমস' (১৮৯৪), 'দ্য হাউন্ড অব বাস্কারভিলস' (১৯০২), 'দ্য রিটার্ন অব শার্লক হোমস' (১৯০৫), 'দ্য ভ্যালি অব ফিয়ার' (১৯১৪), 'হিজ লাস্ট বো' (১৯১৭) এবং 'দ্য কেস বুক অব শার্লক হোমস' (১৯২৭)। শার্লক হোমস রুমে শুধু সাইন অব ফোরেরই আছে ২০০ সংস্করণ। আমেরিকার শার্লক হোমস সোসাইটি থেকে এই সাইন আব ফোর সংগ্রহটি কেনা হয়।

শার্লক হোমস সমালোচকদের মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় সার সিডনি রবার্টস-এর। তাঁর গ্রন্থগুলিও সমৃদ্ধ করেছে এই সংগ্রহশালা।

আমেরিকায় 'দ্য বেকার স্ট্রিট ইরেগুলারস অব নিউ ইয়র্ক' গঠিত হয় ১৯৩৪ সালে। তারপর সারা পৃথিবীতে এ-ধরনের একশোরও বেশি সোসাইটি গড়ে ওঠে। ব্রিটেনের 'শার্লক হোমস সোসাইটি অব লন্ডন' গঠিত হয় ১৯৪১ সালে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে, জাপানে এ-ধরনের বহু সংস্থা গড়ে ওঠে। এইসব সংস্থার প্রকাশিত শত-শত পত্রপত্রিকা রয়েছে ওই সংগ্রহশালায়।

শার্লক নিয়ে তোলা অসংখ্য ফিল্মের অনেকগুলিই এখানে আছে। আর আছে শার্লক-সংক্রান্ত নানা ক্যাসেট, টেপ এবং রেকর্ড। এতে প্রখ্যাত বেতারশিল্পী জন গিলগুদের এবং সার র‍্যালফ রিচার্ডসনের কণ্ঠে শার্লকের নানা উক্তি। শার্লক হোমসের জীবন নিয়ে ফিল্ম ও থিয়েটারে যাঁরা অভিনয় করেছেন তাদের মধ্যে বিশেষ করে উল্লেখ্য বেসিল রথবোন ও উইলিয়াম গিলেট। বেসিল রথবোন শার্লক নিয়ে ১৪টি চলচ্চিত্র করেন। এসবের কিছু-কিছু দেখা যাবে এই সংগ্রহশালায়।

সার আর্থার কোনান ডয়েলের অন্যান্য গ্রন্থও এই সংগ্রহশালাকে সমৃদ্ধ করেছে। ডয়েলের আত্মজীবনী 'মেমোরিজ অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার' বের হয় ১৯২৪ সালে। এটি তো আছেই, সেইসঙ্গে আছে বিভিন্ন দেশের নানা ভাষায় লেখায় সার আর্থার কোনান ডয়েলের অসংখ্য জীবনীগ্রন্থও। সার আর্থার কোনান ডয়েল মারা যান ১৯৩০ সালে। নিউ ফরেস্টে তাঁর সমাধিতে লেখা আছে, 'স্টিল ট্রু। ব্লেড স্ট্রেট। আর্থার কোনান ডয়েল। নাইট। পেট্রিয়ট। ফিজিশিয়ান অ্যান্ড ম্যান অব লেটার্স।'

আর্থার কোনান ডয়েল যে-স্মরণীয় সৃষ্টির জন্য অমর হয়ে আছেন, সেই শার্লক হোমস যেন সজীব জীবন্ত হয়ে আছেন এই সংগ্রহশালায়। মনে হবে রক্তমাংসের শার্লক এখানে হাজির।

সাপ থেকে সাবধান

সম্প্রতি 'প্রাভদা'য় একটা চমকপ্রদ খবর প্রকাশিত হয়েছে। এই খবর থেকে শিক্ষা নেওয়া যায় যে, মাঠে-ঘাটে ঘুমিয়ে পড়া ঠিক নয়। সোভিয়েত সংবাদপত্রের বিবরণ অনুযায়ী কাস্পিয়ান সাগরের কাছাকাছি আজারবাইজান নিবাসী এগারো বছরের একটি বালিকা রোদ-ঝকঝকে দিনের বেলা খেতে টমেটো তুলছিল টমেটো তুলতে-তুলতে ক্লান্ত হয়ে সে খেতের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ে। যখন তার ঘুম ভাঙে তখন দেখে যে প্রায় দমবন্ধ হয়ে আসার জোগাড়। চটপট তাকে নিয়ে যাওয়া হয় বাকুর শিশু-চিকিৎসা কেন্দ্রে। সেখানে মেয়েটিকে প্রায় দু' লিটার নুন-জল খাওয়ানো হয়। একটু পরেই সে বমি করে এবং সুস্থ হয়ে ওঠে। তখনই জানা যায় তার দমবন্ধ হয়ে আসার কারণ : সাড়ে পঁচিশ ইঞ্চি লম্বা একটি ককেশিয়ান ক্যাট স্নেক।

আটলান্টা পশুশালার সরীসৃপ বিভাগের সহ-কর্মাধ্যক্ষ ডেনিস হারম্যান-এর মতে, কোনও মানুষের মুখ দিয়ে পেটে সাপ ঢুকে যাওয়ার ব্যাপারটা একরকম অসম্ভব বলা চলে। তিনি বলেছেন, 'এমন অনেক ঘটনা শোনা গেছে যে, ঘুম ভেঙে কেউ দেখল বুকের ওপর একটা ঝুমঝুমি সাপ কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে। সাপের কাছে ওটা নেহাতই একটা উষ্ণ জায়গা। কিন্তু পেটের ভেতরে ঢুকে গেলে সাপের পক্ষে বেঁচে থাকা মুশকিল। কারণ পাকস্থলীর অ্যাসিড অন্যান্য মাংসের মতোই সাপটিকে হজম করে ফেলার চেষ্টা করবে।'

এমোরি ইউনিভার্সিটি হসপিটালের গ্যাস্ট্রো এন্ট্রোলজিস্ট স্ট্যানলি রিপের মতে, 'রুশ মেয়েটির ঘটনা শুনতে উদ্ভট হলেও একটা সাপ গিলে ফেলা তেমন অসম্ভব নয়। কারণ চিকিৎসার নানা কাজে রোগীর পেটে নমনীয় পাইপ ঢোকানো হয়। সেই পাইপের সঙ্গে ক্যাট স্নেকের মাপের খুব একটা হেরফের নেই। তবে এই ঘটনায় যেটা অস্বাভাবিক সেটা হচ্ছে ঘুমন্ত অবস্থায় একটুও টের না পেয়ে সাপটি গিলে ফেলা। হয় সেই সময়ে মেয়েটি সম্পূর্ণ সচেতন ছিল, অথবা হিস্টিরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে পড়েছিল।'

অভিনব পকেট ভিডিও

অভিনব পকেট ভিডিও 'পকেট ওয়াচ' বের করেছে নিউ জার্সির প্যানাসনিক কম্পানি। এর সাহায্যে ভিডিও দেখা যেতে পারে যখন-তখন। এর মধ্যে রয়েছে প্রমাণ মাপের একটি ভিডিও ক্যাসেট রেকর্ডার এবং চার ইঞ্চি পরদার একটি টেলিভিশন। টেলিভিশনের পরদাটি লিকুইড ক্রিস্টাল ডিসপ্লের সাহায্যে তৈরি। কাঁধে ঝুলিয়ে বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য উপযোগী এই পকেট ভিডিওর ওজন মাত্র পাঁচ পাউন্ড। এর মধ্যে আধুনিক টেলিভিশন ও ভি সি আর-এর যাবতীয় ইলেকট্রনিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা রয়েছে। আশ্চর্য এই প্রমোদ-যন্ত্রটির দাম এক হাজার তিনশো নিরানব্বই ডলার।

গাড়ির জন্য রেডিও

নতুন এই ডিজিটাল রেডিওর নাম 'সি কিউ— আই ডি ৯০'। এই রেডিও গাড়িতে লাগানো থাকলে চিন্তার কোনও কারণ নেই। গাড়ি চালিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে-অঞ্চলেই যান না কেন রেডিও সব সময়েই সুরে বাঁধা থাকবে। এর কারণ, সি কিউয়ের মধ্যে সঞ্চিত রয়েছে দশ হাজারেরও বেশি বেতার কেন্দ্রের প্রচার-কম্পাঙ্ক। ফলে গাড়ি এক কেন্দ্রের আওতা ছাড়িয়ে নতুন কোনও কেন্দ্রের আওতায় ঢুকে পড়লেই এই রেডিওর টিউনার সম্পন্ন করে অটোম্যাটিক টিউনিংয়ের কাজ। তখন স্পষ্ট শোনা যায় নতুন কেন্দ্রের প্রচারিত প্রোগ্রাম। নতুন এই ডিজিটাল রেডিও তৈরি করেছে নিউ জার্সির টেকনিক্স কম্পানি। এর দাম সাতশো নিরানব্বই ডলার।

রাশিয়ান স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের

আগামী দিনের গ্যাগারিনরা

পৃথিবীর ইতিহাসে আজ পূর্ব-পশ্চিমের ঠাণ্ডা লড়াই শেষ। সর্বত্রই গড়ে উঠছে নতুন এক আশার ব্যঞ্জনা, নতুন এক পৃথিবী গড়ার বাসনা। স্কুলের ছেলেমেয়েরাও মহাকাশে যাওয়ার স্বপ্ন দেখে, এমন এক পৃথিবী। স্কুলের ছেলেমেয়েদের মহাকাশচারী তৈরি করার তোড়জোড় প্রথম শুরু হয়েছিল আমেরিকায়, ১৯৮৪ সালে। এই বছরের গোড়ায় জাপানেও বেসরকারি সংস্থাগুলি স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের জন্য শুরু করে মহাকাশে যাওয়ার ক্লাব। স্কুলের ছেলেমেয়েরা মহাকাশে যেতে এখন ভীষণভাবে আগ্রহী। পৃথিবীতে পূর্ব-পশ্চিম এখন আর কোনও বাধাই নয়। ওয়াশিংটন ও টোকিওর পর এবার মস্কো নতুনভাবে ছাত্রছাত্রীদের এই আগ্রহকে অভিনন্দন জানাল।

পৃথিবী বাঁচাতে

পৃথিবী সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করে একটি ডেটাবেস তৈরি করার পরিকল্পনা নিয়েছিলেন ক্যালিফোর্নিয়ার জেট প্রপালশন ল্যাবরেটরির কম্পিউটার-বিজ্ঞানী ভ্যান ওয়ারেন। ওয়ারেনের উদ্দেশ্য ছিল, মহাকাশ থেকে যে-কোনও দৃষ্টিকোণে পৃথিবীকে ঠিক যেমনটি দেখায় তেমনটি করে ফুটিয়ে তোলা তাঁর কম্পিউটারের পরদায়। এই কারণেই তিনি দু'বছর ধরে পৃথিবী ঘিরে পাক-খাওয়া বিভিন্ন কৃত্রিম উপগ্রহের পাঠানো তথ্য তিল-তিল করে সংগ্রহ করছিলেন। গ্রাফিক্স বিশেষজ্ঞ ওয়ারেন কেন যে নিয়মিত কাজের বাইরে এই বাড়তি দায়িত্ব নিচ্ছেন তা ভেবে পাননি ওয়ারেনের ওপরওয়ালারা। এমনকী,এ সম্পর্কে ওয়ারেনের স্ত্রী কিংবা ওয়ারেনের নিজেরও খুব একটা স্পষ্ট ধারণা ছিল না। এমন সময় ক্যালিফোর্নিয়ার সান্টা মোনিকাবাসী শিল্পী টম ভ্যান স্যান্ট টেলিফোনে যোগাযোগ করলেন ওয়ারেনের সঙ্গে।

ভ্যান স্যান্ট একাধারে ভাস্কর, পরিবেশ-অনুরাগী এবং রীতিবিরোধী শিল্পকলার সাধক। তাঁর ইচ্ছে, এমন একটা বিশাল গ্লোব তৈরি করেন যার পাদদেশে কারুকলার বদলে থাকবে কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে পৃথিবীর তোলা ছবির আদল। অর্থাৎ, মোদ্দা কথা, ওয়ারেন যেটা সফট্‌ওয়্যারের মাধ্যমে তৈরির কথা ভাবছিলেন, ভ্যান স্যান্ট সেটাকেই যেন বাস্তব রূপ দিতে চাইছেন। ভ্যান স্যান্টের ভাষায় 'জিওস্ফিয়ার' হবে পৃথিবীর জীবন্ত প্রতিরূপ। একই সঙ্গে এই গোলক পৃথিবী সংক্রান্ত নানা জটিল ব্যাপার ব্যাখ্যা করার কাজে সাহায্য করবে। সুতরাং এই কাজের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিভিন্ন দিক দেখাশোনা করার জন্য ওয়ারেনকে নিয়োগ করেন ভ্যান স্যান্ট, এবং নিজের টাকায় তাঁকে একটি গ্রাফিক্স সুপার কম্পিউটার কিনে দেন। অবশেষে মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা 'নাসা' এই প্রোজেক্টের কাজ চলাকালীন ওয়ারেনের মাইনের খরচ বহন করতে রাজি হয়েছে। গত জানুয়ারি মাসে জিওস্ফিয়ারের সাড়ে সাত ফুট ব্যাসের একটি মডেল তৈরির কাজ শেষ করেছেন ওঁরা দু'জনে। তখন পর্যন্ত প্রোজেক্টের খরচের বহর ছিল তিন লক্ষ ডলার। এই কাজের প্রাথমিক পর্বে ওয়ারেন সত্যি-সত্যিই একটি ডেটাবেস তৈরি করেছিলেন পৃথিবীর যাবতীয় তথ্য নিয়ে। তারপর এই তথ্যের ওপরে নির্ভর করে তৈরি করেন পৃথিবীর একটি কম্পিউটার ছবি। এই ছবিতে তিনি ব্যবহার করেন তিন কোটি কুড়ি লক্ষ পিকচার এলিমেন্ট। এই বছরেরই শেষে ওয়ারেন পাঁচ কোটি বারো লক্ষ পিকচার এলিমেন্ট বা পিক্সেল দিয়ে পৃথিবীর আর একটি কম্পিউটার-ছবি তৈরি করবেন। কম্পিউটারে পৃথিবীর ছবি এত বড় মাপে আর কেউ আগে আঁকেননি। প্রায় একই সময়ে ওয়ারেন ও ভ্যান স্যান্ট তৈরি করবেন একুশ ফুট ব্যাসের একটি জিওস্ফিয়ার মডেল। ভ্যান স্যান্ট ও ওয়ারেনের ধারণা, তাঁদের মডেল পৃথিবী ও তার পরিবেশ সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করে তুলবে। তখন দূষণের হাত থেকে পৃথিবীকে বাঁচাতে সাধারণ মানুষই এগিয়ে আসবেন।

জন্য খোলা হল মহাকাশচারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

সোভিয়েত রাশিয়ার তুলা অঞ্চলে খোলা হয়েছে ছাত্রছাত্রীদের জন্য মহাকাশ প্রশিক্ষণকেন্দ্র। তুলার এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে রয়েছে মহাকাশ যাত্রার উপযোগী সব সাজসরঞ্জাম। ভারশূন্য অবস্থায় কীভাবে থাকতে হবে তার জন্য দেওয়া হচ্ছে উপযোগী সব শিক্ষা। মহাকাশে যাত্রা শুরু করা থেকে অবতরণ সবকিছুই শিক্ষার্থীদের শেখানো হচ্ছে এই প্রশিক্ষণকেন্দ্রে। স্পেসস্যুট পরে এই চঞ্চল বালক-বালিকারা ইতিমধ্যেই খুদে মহাকাশচারী হওয়ার স্বপ্ন দেখছে। তাদের উৎসাহ দেওয়ার জন্য এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে আনা হয়েছে পৃথিবীর প্রথম মহাকাশচারী মেজর ইউরি গ্যাগারিনের স্পেস-ক্রাফটের সিট ও স্পেসস্যুট। বলা বাহুল্য, গ্যাগারিনও ছিলেন জাতিতে রুশ। আর প্রথম মহিলা মহাকাশচারী ভ্যালেন্তিনা তেরেসকোভা ? তিনিও একসময় ছিলেন উচ্ছল এক রুশ বালিকা। তবে, এত ছোট বয়সে তাঁরা কেউই এভাবে স্বপ্ন পূরণের সুযোগ পাননি।

দেখা যাক, ওয়াশিংটন, টোকিও না মস্কো, কোথাকার খুদেরা আগে মহাকাশে যায়। তবে, তা নিয়ে যেন বড়দের মধ্যে আবার ঠাণ্ডা লড়াই না শুরু হয়।

ফোটো : নোভস্তি

ভবিষ্যদ্বাণী ? তাও আবার আজ থেকে প্রায় পাঁচশো বছর আগে ! আজকের বিজ্ঞানের যুগে যুক্তিবাদী মানুষের কাছে এর কোনও মূল্য নেই । তবু নস্ট্রাডামুসের ভবিষ্যদ্বাণীর কথা এখনও অনেকে আলোচনা করেন । কেন ? কী কী ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন নস্ট্রাডামুস ? **অভীক মজুমদার** আলোচনা করেছেন প্রবাদে পরিণত সেই

নস্ট্রাডামুসের অবিশ্বাস্য ভবিষ্যদ্বাণী

যুদ্ধবাজদের সম্পর্কে সাবধান করেছেন নস্ট্রাডামুস

পরমাণু-বোমার ভয়াবহতাও তাঁর নজর এড়ায়নি

আধুনিক যুদ্ধের চেহারাটাও তিনি জানতেন

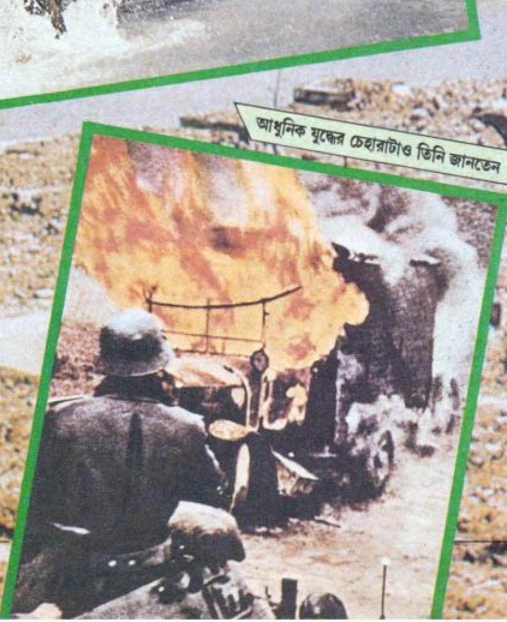

মধ্যযুগেই প্রথম মহাযুদ্ধের কথা জানিয়েছিলেন নস্ট্রাডামুস

ভ্যাটিকান প্রাসাদের অনেক খবরই জানিয়েছিলেন তিনি

গেরিলা-শিবির। নস্ট্রাডামুসের লেখায় আছে ভবিষ্যতের সব গৃহযুদ্ধের কথা

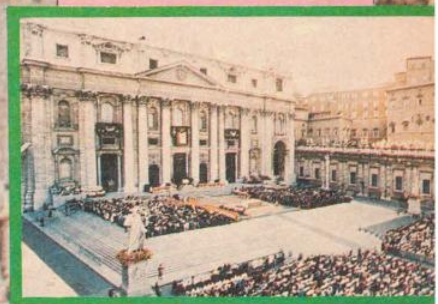

ষোড়শ শতাব্দীতেই নস্ট্রাডামুস ভিয়েতনাম-যুদ্ধ নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন

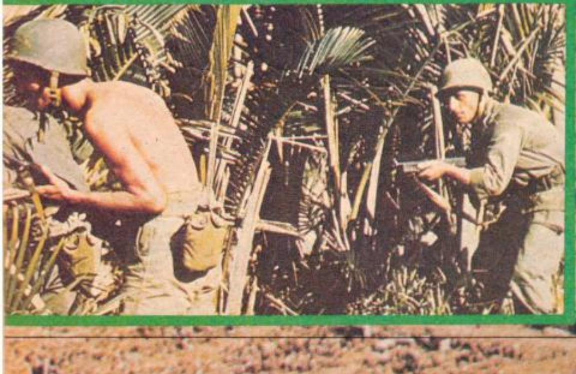

ফরাসি রাজ-পরিবারে একমুহূর্তে নেমে এল শোকের ছায়া। থেমে গেল আনন্দ-উৎসব। একসঙ্গে একজোড়া বিয়ে হচ্ছে রাজ-পরিবারে, সেই আনন্দে মেতে উঠেছিল সারা দেশ। ১৫৫৯ খ্রিস্টাব্দের ১ জুলাই। দুই রাজপুরুষ, রাজা দ্বিতীয় হেনরি আর গ্যাব্রিয়েল ডে লরজেস যিনি মনটোগোমারির অধিকর্তা, বিয়ের উৎসব পালনের অঙ্গ হিসেবে পরস্পরের বিরুদ্ধে বন্ধুত্বপূর্ণ তলোয়ার খেলায় নেমে পড়লেন। বিকেলের পড়ন্ত আলোয় মাঝে-মাঝেই ঝলসে উঠছে দুই অশ্বারোহীর শিরস্ত্রাণ, ঝলসে উঠছে তলোয়ারের তীক্ষ্ণ মুখ। দর্শকরা যদিও জানেন এই লড়াইয়ে কোনও রক্তপিপাসা নেই, আছে কেবল হালকা প্রতিযোগিতা—তবু এই যুদ্ধ-ক্রীড়া মুগ্ধ করে

রেখেছিল তাঁদের অনেকক্ষণ। খেলা শেষ হল। সকলেই বললেন, দু'জনের কেউই জেতেননি, কেউই হারেননি, আনন্দ দিয়েছেন সকলকে। সোনার অলঙ্কারে সুসজ্জিত বাদামি ঘোড়ায় চড়া কিং হেনরি বললেন, আর এক দান লড়াই হয়ে যাক। কাউন্ট অব মনটোগোমারির খুব ইচ্ছে ছিল না, তবু হেনরির পীড়াপীড়িতে রাজি হয়ে গেলেন। এই দ্বিতীয় লড়াই শুরু হতে-না-হতেই ঘটল দুর্ঘটনা। যুযুধান দুটি তলোয়ার আঘাতে দু'টুকরো হয়ে গেল। মনটোগোমারির তলোয়ারের সামনের অংশটা ছিটকে হেনরির মুখের সোনার মুখবর্ম ভেদ করে বিঁধে গেল তাঁর চোখের মধ্যে। চোখের পলক পড়তে-না-পড়তেই রক্তাপ্লুত রাজা শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন। চারদিকে বিষাদের ছায়া নেমে এল। কান্নায় ভেঙে পড়লেন সম্ভ্রান্ত মহিলারা। তখন বেদনায় উদ্বেল হয়ে অ্যানে ডে মনটমোরেনসি বললেন, "অভিশাপ দাও সেই মানুষটিকে, যিনি দৈববলে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন এই দুর্ঘটনার, অশুভ লগ্নের! কী নির্ভুল, কী অভ্রান্ত তাঁর উচ্চারণ!"
যাঁর উদ্দেশে এই অভিশাপ দিয়েছিলেন মনটমোরেনসি, তিনি আর কেউ নন, মানব-ইতিহাসের এক বিস্ময়ব্যক্তিত্ব মিশেল ডে নসট্রেডেম। যিনি চার শতক জুড়ে সারা পৃথিবীর কোণে-কোণে 'নস্ট্রাডামুস' নামে খ্যাত। ফরাসি রাজবংশে এই ঘটনা যে ঘটতে চলেছে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা তিনি করেছিলেন, ওই দিনের চার বছর আগে, তাঁর প্রকাশিত দশ খণ্ডের ভবিষ্যদ্বাণী সঙ্কলনের প্রথম খণ্ডে। এই খণ্ডের পঁয়ত্রিশ নম্বর ভবিষ্যদ্বাণীতে তিনি লিখেছিলেন ফরাসি দেশের ভবিষ্যৎ প্রসঙ্গে এই পঙক্তিগুলি:

তরুণ সিংহ তার বয়স্ক প্রতিদ্বন্দ্বীকে হারাবে

যুদ্ধক্ষেত্রে—প্রথমবার নয়, দ্বিতীয়বার
সোনার মুখচ্ছদ ভেদ করে খুলে আসবে চোখ

রক্তাক্ত ক্ষত, হায় কী বীভৎস মৃত্যু রাজার।

অবিশ্বাস্য ক্ষমতা ছিল নস্ট্রাডামুসের! প্যারিসের লোকজন খেপে উঠেছিলেন কিং হেনরির আকস্মিক এই মৃত্যুতে, ভবিষ্যদ্বক্তা নস্ট্রাডামুসের ওপর। শেষ পর্যন্ত অবশ্য তাঁরা নিজেদের সামলে নিয়েছিলেন। যে লোকটি ভবিষ্যতের চেহারা দেখতে পায়, সে তো নেহাত সাধারণ লোক নয়। সত্যিই এক যুগান্তকারী প্রতিভা!
শুধু এই ঘটনাই নয়, আগামী বহু শতকে কী-কী ঘটতে চলেছে, মানবসভ্যতা কতদূর অগ্রসর হচ্ছে, আবির্ভূত হবেন কোন কোন

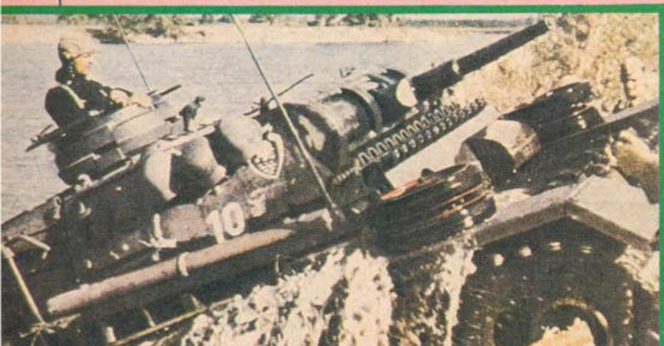

আধুনিক ট্যাঙ্ক, বিমান সবকিছুই ছিল এই ভবিষ্যদ্বক্তার নখদর্পণে

হিটলারের চক্রান্ত

বোমা রাখা ছিল হিটলারের একটি সভায়। সেটা ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দ। হিটলার আগেভাগে সভা শেষ করে চলে গিয়েছিলেন এবং বিস্ফোরণে সেই প্রেক্ষাগৃহ ধ্বংস হয়ে যায়।
হিটলারের মাথায় নস্ট্রাডামুস আর তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীর কথা ঢোকান গোয়েবলস। ক্রাফট নামে এক জ্যোতিষীকে নিযুক্ত করা হয়। ১৯৩৯ সালের ওই দুর্ঘটনার আশঙ্কা জানিয়ে ক্রাফট হিটলারকে টেলিগ্রামও করেছিলেন। হিটলারের নস্ট্রাডামুসে বিশ্বাস চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেল এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই। ক্রাফট কিন্তু এবার বেঁকে বসলেন। চলল অমানুষিক অত্যাচার। ১৯৪১ সালে এক বন্দিশিবিরে ক্রাফটের মৃত্যু হল। হিটলার কিন্তু সমানে অন্যান্য জ্যোতিষীর সাহায্যে নস্ট্রাডামুসের সূত্রগুলিকে সুচতুরভাবে নিজের পক্ষে ব্যাখ্যা করতে লাগলেন। মানুষকে বোঝাতে চাইলেন নস্ট্রাডামুস বলে গেছেন তিনিই হবেন মানুষের রক্ষাকর্তা, পৃথিবীর সব দেশের একচ্ছত্র সম্রাট। তাঁর সেই চক্রান্ত এবং ভুল ব্যাখ্যায় মানুষকে বিভ্রান্ত করা যে শেষপর্যন্ত সম্ভব হয়নি, তা তো আমরা জানি।

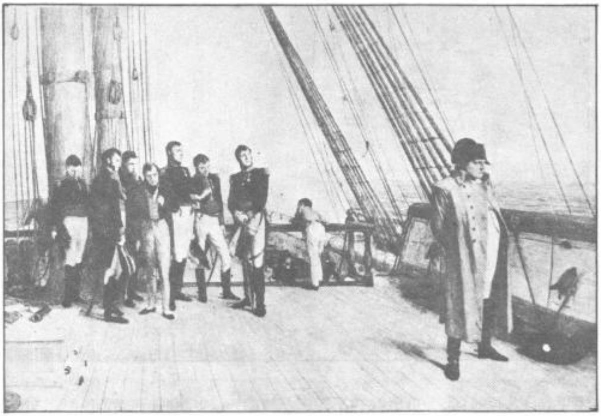

নেপোলিয়ান সম্বন্ধে নস্ট্রাডামুসের বেশ কিছু ভবিষ্যদ্বাণী মিলে গিয়েছিল। এই ফরাসি সম্রাটের রাজচিহ্ন, বিদ্যুৎ-চমকের মতো তাঁর তীব্র উত্থান— এ-সবই বলে গিয়েছিলেন নস্ট্রাডামুস। এমনকী,বলেছিলেন সেন্ট হেলেনা দ্বীপে তাঁর করুণ নির্বাসনের কথাও।

রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, আর কোন কোন দেশে ঘটবে উত্থান-পতনের কী কী ঘটনা, তার বিশদ বিবরণ পাওয়া যাবে নস্ট্রাডামুসের অজস্র ভবিষ্যদ্বাণীতে। প্রতিটি ঘোষণাই চার পঙ্‌ক্তির কবিতায়। তিনি পরিকল্পনা করেছিলেন দশ খণ্ডে বিবৃত করবেন তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীগুলি, প্রতি খণ্ডে থাকবে একশোটি চার পঙ্‌ক্তির কবিতা। ৯৪২টি এমন স্তবক লিখে যেতে পেরেছিলেন তিনি, শেষ করার আগেই মারা যান। দশটি খণ্ডের শেষ খণ্ডটি তাই অসম্পূর্ণ। প্রতিটি খণ্ডের নাম দিয়েছিলেন তিনি 'সেনটেন্স', যেগুলি 'সেঞ্চুরি' নামেই বিশ্বজোড়া খ্যাতি পেয়েছে।

অনেকক্ষেত্রে তিনি নাম উল্লেখ পর্যন্ত করে দিয়েছেন বহু আগামী ব্যক্তিত্বের, জানিয়ে দিয়েছেন নির্ভুল সাল তারিখ। হয়তো সেই ঘটনা বা ব্যক্তিত্ব তাঁর মৃত্যুর তিন-চারশো বছর পরের! ভবিষ্যদ্বাণী তো অনেকেই করেন, কার জীবনে কী ঘটতে চলেছে, আগামী দশকে পৃথিবীতে কী ঘটবে—এসব বিষয়ে সব যুগেই দেখা যায় বেশ কিছু লোক নিজেদের অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন হিসেবে প্রচার করে নানা বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করছেন। সেইসব ভবিষ্যদ্বাণীর অধিকাংশই যে বাস্তবে মেলে না, তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু, নস্ট্রাডামুসের কথা আলাদা। তিনি একদিকে বিস্ময়কর, অন্যদিকে রহস্যময়। তাই তাঁকে বলা হয়, 'দ্য কিং অ্যামংস্ট প্রফেটস', 'ভবিষ্যৎদ্রষ্টাদের সম্রাট'।

নস্ট্রাডামুসের হেঁয়ালিভরা ভাষা

নস্ট্রাডামুসের সেঞ্চুরির ভবিষ্যদ্বাণীগুলি নিয়ে গবেষণা ও ব্যাখ্যার প্রয়োজন হচ্ছে কেন? কোনও-কোনও ভবিষ্যদ্বাণীর ক্ষেত্রে নস্ট্রাডামুস সহজ, সরল, স্পষ্ট, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তিনি ব্যবহার করেছেন হেঁয়ালিভরা ভাষার আড়াল। সেই আপাতদুর্বোধ শব্দ বা পঙ্‌ক্তিগুলিই আবার তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীকে ঠিক-ঠিকভাবে বুঝবার প্রধান চাবিকাঠি। সেই ভাষা একাধারে বুদ্ধিদীপ্ত, তাৎপর্যময় এবং অন্যদিকে অত্যন্ত জটিল। যেমন ধরা যাক, দেশের নাম। নস্ট্রাডামুস প্রায়ই একটি দেশের কথা উল্লেখ করেছেন তাঁর সেঞ্চুরিতে, যে-দেশ বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ধাপে-ধাপে উন্নতি ও সমৃদ্ধির শীর্ষবিন্দু স্পর্শ করবে। তার নাম তিনি বলেছেন 'আমোরিক' (Amorique)। স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে দেশটি আমেরিকা। আবার, আয়ার্ল্যান্ড সম্পর্কিত একটি ভবিষ্যদ্বাণী প্রসঙ্গে সেই দেশের রাজা ও রানির উল্লেখ করেছেন ব্রিটেনের কাছাকাছি 'একটি দ্বীপ'-এর রাজপরিবার হিসেবে। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে আশ্চর্যভাবে সেই ভবিষ্যদ্বাণী মিলে গেছে। তার আগেই নস্ট্রাডামুসের ভবিষ্যদ্বাণীর এক অন্যতম স্বনামধন্য ব্যাখ্যাকার এডগার লিওনি বলেছিলেন যে, ওই দ্বীপ আয়ার্ল্যান্ড এবং ওই রাজা অষ্টম এডওয়ার্ড। তাঁর কথা মিলে যাওয়ার পর সকলেই স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন।

আয়ার্ল্যান্ডের রাজা ও রানি : মিলেছিল নস্ট্রাডামুসের ভবিষ্যদ্বাণী

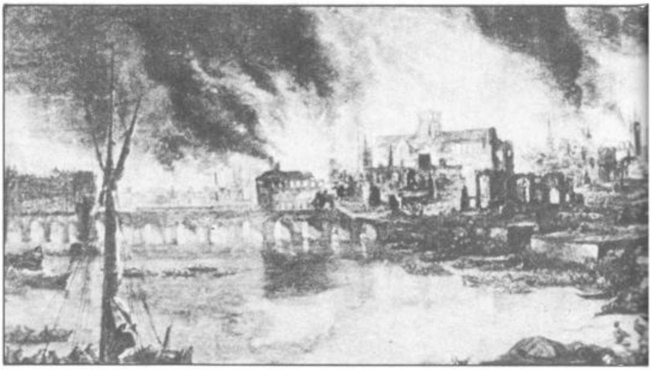

ইংরেজিতে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারার ক্ষমতাকে বলা হয় প্রফিসি । ভবিষ্যদ্বক্তাদের বলা হয় প্রফেট ।

প্রফিসি শব্দটি এসেছে গ্রিক ভাষা থেকে, যার অর্থ ছিল 'আগে বলে দেওয়া' । ওল্ড টেস্টামেন্টে উল্লেখ আছে এ-ধরনের ভবিষ্যৎদ্রষ্টাদের, বলা আছে তাঁদের অবিশ্বাস্য ক্ষমতার কথা । প্রাচীন গ্রিস, রোম, মিশরের ধর্মীয় পুঁথিতে বলা হয়েছে, ঈশ্বর মানুষকে ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা বা আসন্ন দুঃসময় সম্পর্কে সচেতন করে দেন প্রফেটদের মাধ্যমে । বাইবেলের সমসাময়িককালে সারা ইউরোপে বিশ্বাস করা হত প্রফেটরা ঈশ্বরের কাছ থেকে সরাসরি ভবিষ্যতের সংবাদ পেয়ে যান, তাঁরাই শুনতে পান দৈববাণী ।

নস্ট্রাডামুস সম্ভবত মানবসভ্যতার এত বছরের ইতিহাসে সবচেয়ে আলোচিত প্রফেট । তাঁর হেঁয়ালিভরা ভাষায় লেখা ভবিষ্যদ্বাণীগুলি নিয়ে গবেষণা হয়েছে প্রচুর, নানাজনে নানাভাবে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন বিভিন্ন সাম্প্রতিক ঘটনা । কোনও-কোনও ভবিষ্যদ্বাণী আজও বোঝা যায়নি । এই নিয়ে বিতর্কের ঝড় বয়ে গেছে । কিন্তু বেশিরভাগ ভবিষ্যদ্বাণীই সহজবোধ্য সে-সবই বিশ্লেষণ করতে উদগ্রীব পণ্ডিতেরা ।

নস্ট্রাডামুসের জন্ম ১৪ ডিসেম্বর, ১৫০৩ খ্রিস্টাব্দ (গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ২৩ ডিসেম্বর) । ফ্রান্সের সেন্ট রেমি ডে প্রভিন্স-এ । ইহুদি পরিবারের এই ছেলেটি ১৫১২ খ্রিস্টাব্দে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হন । প্রাচীন ইহুদি সংস্কৃতি সম্পর্কে অবশ্য তাঁর আগ্রহ ছিল অটুট । হয়তো ভবিষ্যৎদর্শনের প্রথম প্রেরণা এসেছিল কোনও সুপ্রাচীন ইহুদি পুঁথি থেকেই । ছেলেবেলা থেকেই নস্ট্রাডামুস অসামান্য মেধাবী ছাত্র । লাতিন, গ্রিক, হিব্রু প্রভৃতি ভাষা, অঙ্ক,জ্যোতির্বিদ্যা সব বিষয়েই তাঁর পারদর্শিতা অতুলনীয় । বড় হয়ে তিনি হলেন এক নামী চিকিৎসক— যেমন তাঁর রোগ ধরার ক্ষমতা, তেমনই অব্যর্থ তাঁর ওষুধ । প্লেগ নিরাময়ের ওষুধ বের করেছিলেন তিনি । ১৫৪৭ থেকেই তিনি ভবিষ্যৎদর্শন শুরু করেন এবং তাঁর সুবিখ্যাত দশ খণ্ডে লেখা গ্রন্থ 'লে প্রফেটিস ডে মিশেল ডে নস্ট্রাডামুস' সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয় তাঁর মৃত্যুর পরে । নস্ট্রাডামুসের মৃত্যু হয় ১৫৬৬ খ্রিস্টাব্দে জুলাই মাসের এক তারিখ । মজার ব্যাপার এই যে, নিজের মৃত্যুর পুরো ঘটনাটা লিখে গেছেন নস্ট্রাডামুস । প্রথম সেঞ্চুরি প্রকাশিত হয়েছিল ১৫৫০ খ্রিস্টাব্দে । তাতেই ছিল নিজের মৃত্যুর পূর্ব-ঘোষণা । ফ্রান্সের সালোন-এ রাজবংশের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিসেবে শেষ জীবন কাটিয়েছেন নস্ট্রাডামুস । সালোনে বসেই সেঞ্চুরির বেশিরভাগ অংশ লিখেছেন তিনি । মৃত্যুর খবর পেয়ে বন্ধুরা এসে দেখলেন, ভবিষ্যদ্বাণীর সঙ্গে হুবহু মিলে গেছে নস্ট্রাডামুসের অন্তিম শয্যা । 'বেঞ্চে থাকব শুয়ে শেষদিন/বিছানায় নয়…/পরনে থাকবে নীল আলখাল্লা, পাদ্রি এসে পৌঁছবে দেরিতে…/রাত্রে নামবে বৃষ্টি ।'

সাহিত্যে নস্ট্রাডামুস

জেরেমি সভার্স তাঁর এক চিঠিতে প্রোফেসর শঙ্কুকে জানিয়েছিলেন এই কথাগুলি : 'তুমি ত ফরাসি গণৎকার নস্ট্রাডামুসের কথা জানো । নস্ট্রাডামুস জন্মেছিলেন ১৫০৩ খ্রিস্টাব্দে, এবং তিনি কবিতায় বহু ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন, যার অনেকগুলোই ফলে গেছে । লন্ডনের প্লেগ ও অগ্নিকাণ্ড, ফরাসি বিপ্লবে সম্রাট ষোড়শ লুইয়ের লাঞ্ছনা, নেপোলিয়নের উত্থান ও পতন, লুই পাস্তুরের যুগান্তকারী আবিষ্কার, এমনকী আমাদের যুগে হিরোশিমা ও নাগাসাকির ওপর আণবিক বোমা বর্ষণ, অষ্টম এডওয়ার্ডের সিংহাসনত্যাগ, হিটলারের অভ্যুত্থান ইত্যাদি অনেক কিছুই নস্ট্রাডামুস সঠিকভাবে বর্ণনা করে গিয়েছিলেন ।' "ডন ক্রিস্টোবাল্ডির ভবিষ্যদ্বাণী" গল্পে এই চিঠির হদিস মিলবে ।

গেব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ : নোবেলজয়ী এই সাহিত্যিকের লেখায় আছে নস্ট্রাডামুসের কথা

সারা পৃথিবীর বহু সাহিত্যেই নস্ট্রাডামুসের বহু উল্লেখ পাওয়া যায় । এই মুহূর্তে মনে পড়ছে,গেব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজের উপন্যাস 'ওয়ান হান্ড্রেড ইয়ারস অব সলিচ্যুড' আর আগাথা ক্রিস্টির রহস্যোপন্যাস 'দ্য পেল হর্স'-এর কথা । নস্ট্রাডামুসকে নিয়ে বিশ্লেষণমূলক বইও বের হয়েছে বহু । তার মধ্যে এডগার লিওনির 'নস্ট্রাডামুস : লাইফ অ্যান্ড লিটারেচার', এরিকা চিটম্যান-এর 'প্রফিসিস অব নস্ট্রাডামুস' ও 'দ্য ফারদার প্রফিসিস অব নস্ট্রাডামুস' বিখ্যাত ।

সম্প্রতি হলিউড থেকে নস্ট্রাডামুসের ভবিষ্যদ্বাণী ও তাঁর জীবন নিয়েপূর্ণ দৈর্ঘ্যের একটি চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে । তার নাম 'দ্য ম্যান হু নিউ দ্য ফিউচার' । তার ভিডিও ক্যাসেট কলকাতাতেও এসে গেছে ।

সত্য হয়েছিল নস্ট্রাডামুসের ভবিষ্যদ্বাণী ! তাঁর মৃত্যুর ঠিক একশো বছর পর, ১৬৬৬ সালে আগুনে প্রায় ধ্বংসে হয়ে গিয়েছিল লন্ডন শহর । ভেঙে পড়েছিল বিশাল সেন্ট পল্‌স ক্যাথিড্রাল ।

নস্ট্রাডামুস সেই বিরল প্রতিভাবানদের একজন, যিনি লিখে গেছেন যে,তিনি সরাসরি ভবিষ্যৎ ঘটনার ভেতরে পৌঁছে যেতে পারতেন, অনুভব করতে পারতেন সেই স্থান-কাল-পাত্র ও চারপাশের নানা বিষয় । নস্ট্রাডামুসের ভবিষ্যৎদর্শনের ক্ষমতা কিন্তু স্বপ্ন বা ঘোরের মধ্যে ঘটত না, প্রকাশ পেত না । এজন্য তিনি দুটি বিশেষ প্রাচীন ঐতিহ্যসম্মত পদ্ধতি অবলম্বন করতেন । প্রথম সেঞ্চুরির দু' নম্বর উদ্ধৃতিতে এই পদ্ধতির কথা আছে । নিশুতি রাত্রিতে ভবিষ্যৎদৃশ্যকে আহ্বান করতেন নস্ট্রাডামুস, তাঁর নির্জন 'স্টাডি' অর্থাৎ পড়ার ঘরে । একটা টেবিল আর একটা চেয়ার । টেবিলের ওপর জ্বলছে হলদে মোমবাতি । প্রথমে তাঁর দু' পায়ের পাতা আর আলখাল্লার হাতা দুটি জলে ভিজিয়ে নিলেন তিনি । এর ফলে নাকি 'পার্থিব বন্ধনমুক্তি' ঘটে । টেবিলের ওপর রাখলেন ছোট একটি পেতলের তেপায়া টুল, তার ওপর বসালেন একপাত্র জল । চোখ খোলা । ওই জলের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে একসময় জলে ভেসে উঠতে লাগল ভবিষ্যতের ঘটনাবলী । অন্য পদ্ধতিটি একরকম অনেকটা । এক্ষেত্রে নস্ট্রাডামুস সাহায্য নিতেন একটি জাদুদণ্ড বা ম্যাজিক লাঠির । সেই লাঠি ছোঁয়াতে হত পেতলের তেপায়া টুলের গায়ে, পাত্রের জল ধীরে-ধীরে ঘোলা হয়ে উঠত, যেন মেঘ নেমে এসেছে তার মধ্যে, তারপর সেই অবিশ্বাস্য ঘটনা—দেখা দিত আগামী দিনের নানা চলচ্ছবি । নস্ট্রাডামুসের ভাষায়, 'ঈশ্বর স্বয়ং এসে তখন বসেন পাশে ।'

আধুনিক যন্ত্রযুগে বসে অবশ্য মনে প্রশ্ন জাগে, সত্যিই কি সম্ভব এমন পদ্ধতির মাধ্যমে ভবিষ্যৎকে দেখা বা জানা ? নস্ট্রাডামুস যে-কথা লিখে গেছেন তার সত্যাসত্য যাচাই করে দেখা আজ আর সম্ভব নয় । তবে ফরাসি দেশের

ইতিহাসের আগামী ঘটনাবলীর কথা লিখতে লিখতে তিনি প্রথম সেঞ্চুরির যাট সংখ্যক সূত্রে লিখছেন, 'এক সম্রাট জন্মাবেন ইতালির কাছে, যার জন্য সাম্রাজ্য জুড়ে একদিন আসবে দুঃসময়...' মুহূর্তে আমরা বুঝতে পারি, তিনি বলছেন নেপোলিয়নের কথা, যিনি জন্মেছিলেন ইতালির খুব কাছে, কর্সিকায় । আরও স্পষ্ট করে বলা আছে সম্রাটের নাম, আট নম্বর সেঞ্চুরির প্রথম সূত্রে

পো নে লরন আনবেন ধ্বংসে আর আগুন
তিনি এক অশুভ শক্তি, বহু ক্ষয়ক্ষতি হবে যুদ্ধে ।

আসল-নকল

যে-কোনও ভবিষ্যদ্বাণীই বিনা প্রশ্নে মেনে নেওয়া যায় না । নস্ট্রাডামুসের পরবর্তী শতকগুলিতে বিশ্বজুড়ে গজিয়ে উঠেছে ব্যাঙের ছাতার মতো ভবিষ্যদ্বক্তারা । ব্যক্তি বা দেশ, বৈজ্ঞানিক কার্যকলাপ বা বিশ্ব-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, যে-কোনও বিষয়েই তাঁরা দাবি করেন অভ্রান্ততম প্রফিসির পরিচয় দিচ্ছেন তাঁরা । তাঁদের কথামতো ঘটতে চলেছে ঘটনাবলী । নস্ট্রাডামুসের মতো প্রতিভাবান কেউই নন এঁরা, তাঁদের মধ্যে নেই তেমন প্রজ্ঞার দীপ্তি । কিন্তু, নস্ট্রাডামুসের উদাহরণ ব্যবহার করে তাঁরা সাধারণ মানুষের বিশ্বাস আদায় করতে চাইছেন সর্বদা । তাঁরা বলতে চাইছেন, ভবিষ্যদ্বাণী মাত্রই নির্ভুল । এ-সম্পর্কে একটি গল্প আছে । নস্ট্রাডামুসের মৃত্যুর পর তাঁরই এক দূর-সম্পর্কের আত্মীয় নিজেকে 'জুনিয়ার নস্ট্রাডামুস' নামে

পরিচয় দিতে থাকেন এবং নিখুঁত স্থান-কাল-পাত্রের উল্লেখ করে ভবিষ্যদ্বাণী করার ক্ষমতা তাঁরও আছে, এ-কথা ঘোষণা করেন । নিজেকে নস্ট্রাডামুসের সমকক্ষ এক প্রতিভা হিসেবে প্রচার চালান । তিনি বলেন যে, আগামী সাতদিনের মধ্যে তাঁদের শহর আগুনে ধ্বংস হয়ে যাবে । এই ঘোষণার পর ছ'দিন কাটল । শহরের মানুষ ভীত, সন্ত্রস্ত । কেউ-কেউ ছেড়ে যাচ্ছেন বাসস্থান, আত্মীয়স্বজন । ষষ্ঠদিন রাত্রে নগর-রক্ষীরা ওই ভবিষ্যদ্বক্তাকে গ্রেফতার করে নিয়ে এল বিচারসভায় । রাত্রির অন্ধকারে ওই লোকটি শহরের বিভিন্ন প্রান্তে বাড়িঘর আর দাহ্যপদার্থের গুদামে আগুন লাগাচ্ছিল । নিজের ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবে রূপায়িত করতে সক্রিয় হয়ে উঠেছিল ওই লোকটি, তার শহর যাতে আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায় । সৈন্যরা তাকে ধরতে না পারলে লোকটি সত্যিই হয়তো নিজেকে পৃথিবীর সেরা ভবিষ্যদ্বক্তাদের একজন বলে দাবি করত ।

ছবি : দেবাশিস দেব

ঈশ্বরের অনুশাসন হাতে মোজেস। ইহুদি সভ্যতা নিয়ে নস্ট্রাডামুসের আগ্রহ ছিল অসীম

একটু ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে পড়লে বোঝা যায় নেপোলিয়নের নাম। চতুর্থ খণ্ডের চুয়ান্ন নম্বর সূত্রে আরও বলেছেন নস্ট্রাডামুস, 'এই সম্রাট নেবেন এমন এক উপাধি যা আগে কোনও/ফরাসি রাজার নামে ছিল না কখনও।/ তিনি এক মহাশক্তি, ধ্বংসস্রষ্টা, যুদ্ধ-রক্তে সর্বদা উন্মুখ...।' স্পষ্টত বোঝা যায় উপাধিটি 'বোনাপার্ট', ওই সূত্রেই সেই দিগ্বিজয়ী সম্রাটের ইতালি, স্পেন ও ইংল্যান্ড বিজয়ের কথা আভাসে বলা আছে। চতুর্থ খণ্ডেরই ছাব্বিশ সংখ্যক সূত্রে আশ্চর্যভাবে বলা আছে নেপোলিয়নের প্রতীক হবে মৌমাছি, বলা আছে কীভাবে তিনি সিংহাসন দখল করবেন। বারবার 'ধ্বংসকর্তা', 'যুদ্ধবাজ', 'বজ্রশক্তি' হিসেবে নেপোলিয়নের উল্লেখ করেছেন নস্ট্রাডামুস, তার কারণ হয়তো এই যে, গ্রিক ভাষায় 'নিয়াপললান' শব্দের অর্থ ধ্বংসকারী ব্যক্তি যিনি যুদ্ধে পারদর্শী। প্রথম খণ্ডের বত্রিশ ও ষাট নম্বর সূত্রে নেপোলিয়নের সেন্ট হেলেনা দ্বীপে নির্বাসিত, ক্ষমতাচ্যুত শেষজীবনের কথা নির্ভুলভাবে বলা হয়েছে।

শুধু ফরাসি দেশের আগামী রাজনৈতিক ঘটনাই নয়, বিশ্ব ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনা-দুর্ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়েছেন নস্ট্রাডামুস, যার মধ্যে বিখ্যাত দ্বিতীয় সেঞ্চুরির একান্ন সংখ্যক ভবিষ্যদ্বাণী

লণ্ডনে ঘটবে এক প্রবল অশুভ
পুড়বে আগুনে সব তিনগুণ কুড়ি যোগ ছয়ে,
সুপ্রাচীন স্থাপত্য পড়বে বিদীর্ণ হয়ে উঁচু থেকে
মরবে অনেক লোক, পালাবে অনেকে তার ভয়ে।

সত্যিই, লন্ডনে ভয়াবহ আগুন ছড়িয়েছিল ১৩৬৬ খ্রিস্টাব্দে (৬৬ মানে, তিনগুণ কুড়ি যোগ ছয়ে) অন্যান্য সুপ্রাচীন গির্জার সঙ্গে ভেঙে পড়েছিল সুবিশাল সেন্ট পলস ক্যাথিড্রাল। মানুষেরা কাঠের বাড়ি ছেড়ে প্রাণ বাঁচাতে পালিয়েছিল উর্ধ্বশ্বাসে, মারা গিয়েছিল বহু মানুষ। সালটা আবার উল্লেখ করি, ১৬৬৬—অর্থাৎ নস্ট্রাডামুসের মৃত্যুর ঠিক একশো বছর পরে!

প্রতি খণ্ড সেঞ্চুরির পাতায়-পাতায় বিস্ময়। নাম করে-করে তিনি বলে গেছেন বিংশ শতাব্দীর বিভিন্ন ঘটনা, সাল-তারিখ সমেত নানা ব্যক্তিত্বের কার্যকলাপ। তিনি বলে গেছেন স্পেনের শাসক ফ্রাঙ্কোর কথা, নাম সমেত লিখে গেছেন লুই পাস্তুরের আবিষ্কারের কাহিনী, বলে গেছেন আধুনিক যুদ্ধাস্ত্র, রকেট, বোমারু বিমানের কথা, কৃত্রিম বৃষ্টিপাতের কথা, ওলিম্পিকে (১৯৭৬) ইজরায়েলি খেলোয়াড় হত্যার কাহিনী, ভিয়েতনামের যুদ্ধ, মানুষের মহাকাশযাত্রার বিবরণ। বিষয়টি শুধু রোমহর্ষক নয়, প্রায় অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলা।

হিটলার এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কথাই ধরা যাক। দ্বিতীয় খন্ডের চব্বিশ নম্বর সূত্রে লিখেছেন নস্ট্রাডামুস, বিংশ শতকের প্রথমদিকের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হিসেবে

জন্তুরা হিংস্র খিদে নিয়ে নদী পেরিয়ে আসবে
যুদ্ধ শুরু হবে হিসটারের বিরোধী
সে খাঁচায় বন্দী করবে সব মহান প্রতিভাদের
জার্মানির এই সন্তান কোনও আইন মানবে না তার মৃত্যু অবধি।

হিটলারকে স্পষ্টতই নস্ট্রাডামুস হিসটার বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ভৌগোলিক সীমারেখা মিলিয়ে দিয়েছেন, মিলিয়ে দিয়েছেন আরও নানা ঘটনা। যুদ্ধের বর্ণনাও দিয়েছেন, বলা আছে মুসোলিনি আর হিটলারের চুক্তির কথা।

মনেপ্রাণে নস্ট্রাডামুস ছিলেন খ্রিস্টধর্মাবলম্বী। ওই ধর্মের একান্ত অনুগত অনুসারী। ধর্মের প্রতি তাঁর এই অনুরাগের চিহ্ন আছে সেঞ্চুরির পাতায়-পাতায়। বারবার তিনি ফিরে গেছেন

তিনশো বছর আগেই বলেছিলেন মেক্সিকোতে অ্যাসিড-বৃষ্টিপাত

ভ্যাটিকান সিটিতে কোন পোপের পর কোন পোপ নির্বাচিত হবেন সেই প্রসঙ্গে। অদ্ভুত প্রতিভাবলে তিনি উল্লেখ করেছেন পোপেদের নাম, তাঁদের সময়কাল। কোনও-কোনও ক্ষেত্রে তিনি সাহায্য নিয়েছেন সাঙ্কেতিক ভাষার। তাঁর উল্লিখিত অনুষঙ্গগুলি বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করলে সহজেই বোঝা যায় কার কথা বলতে চাইছেন নস্ট্রাডামুস। সেক্ষেত্রে, এমন অনেক সূক্ষ্ম বিষয়ের প্রতীক ব্যবহার করে গেছেন নস্ট্রাডামুস, যেগুলি কেবল তাঁর তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও অসামান্য ক্ষমতাকেই চিহ্নিত করে না, প্রমাণ করে যে, অবিশ্বাস্য হলেও এ-কথা বোধ হয় অনেকটাই ঠিক যে তিনি ভবিষ্যদৃশ্যের মধ্যে ঢুকে পড়তে পারতেন।

পোপ জন-২৩ এর উল্লেখ করতে গিয়ে নস্ট্রাডামুস লিখেছেন, সেঞ্চুরির ষষ্ঠ খণ্ডের কুড়ি নম্বর সূত্রে, তাঁর বাঁ দিকে থাকবে সিংহ। আশ্চর্য ঘটনা এই যে, পোপ জন-২৩ সর্বদা তাঁর কোটের বাঁ হাতের ওপর একটি সিংহের খুদে ছুঁচে আঁকা ছবি বুনে রাখতেন। অন্যদিকে চতুর্থ সেঞ্চুরির একাদশতম উদ্ধৃতিতে বলা হয়েছে পোপ জন পল-১-এর আকস্মিক মৃত্যুর কথা।

সাম্প্রতিক কয়েকজন ভবিষ্যদ্বক্তা

ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট : জেন জানতে পেরেছিলেন তাঁর মৃত্যুর দিন

কেনেডি : জেন জানতেন তাঁকে হত্যা করা হবে

জেন ডিকসন : এ-যুগের মহিলা-নস্ট্রাডামুস ?

নস্ট্রাডামুসের আগে যেমন জন্মেছিলেন বেশ কয়েকজন প্রফেট বা ভবিষ্যদ্বক্তা, তেমনই তাঁর পরেও বহু দেশবিদেশের ভবিষ্যদ্বক্তার কথাও জানতে পারি আমরা। তাঁদের মধ্যে অনেকে এখনও জীবিত। আগামী বছরগুলো সম্পর্কে তাঁদের অনেকেই নানা পূর্ববার্তা ঘোষণা করেছেন। তবে নিকট-ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা অপেক্ষাকৃত সহজ। কেননা, বিভিন্ন রাজনৈতিক আর্থ-সামাজিক ব্যাপার লক্ষ করে মোটামুটি আগামী ঘটনার গতিপ্রকৃতি কিছু আন্দাজ করা যায়। এঁদের ভবিষ্যদ্বাণী তাই প্রফিসি নয়।
তবে এঁদের মধ্যে সুপ্রাচীন প্রফেট ম্যালাকি, বা তাঁর পরবর্তী সময়ের জে ডব্লিউ ডান বিখ্যাত। এইচ.জি. ওয়েলস বা জর্জ অরওয়েলের মতো লেখক শুধুমাত্র কল্পনার নির্ভরে দেখতে চেয়েছিলেন ভবিষ্যতের একটা চেহারা। ফলে, খুব যে সঠিকভাবে মিলেছে তাঁদের কল্পনা, এমন নয়।
তবে সাম্প্রতিক দু'জন ভবিষ্যদ্বক্তার নাম উল্লেখ করতে হয়। এডগার কেইসি (১৮৭৭-১৯৪৫) একজন চিকিৎসক। কয়েকটি ভবিষ্যদ্বাণী তিনি করেছিলেন ঘোরের মধ্যে। দ্বিতীয়জন জীবিত। তাঁর নাম জেন ডিকসন। মার্কিন এই মহিলা দাবি করেছেন যে, জন কেনেডির হত্যার তেরো বছর আগেই তিনি এই ঘটনা মানসচক্ষে দেখেছিলেন এবং কেনেডিকে সাবধান করে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি আগে থেকে নাকি জানতে পেরেছিলেন জুনিয়ার মার্টিন লুথার কিং-এর হত্যার কথাও। ইনি বলেছেন যে, প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের মৃত্যু কবে হবে সে-কথা তিনি আগে থেকেই টের পেয়েছিলেন। ডিকসন যাই বলুন না কেন, তিনি কিন্তু নস্ট্রাডামুসের মতো ক্ষমতাসম্পন্ন নন।

আপনার সোনামণিকে যখন স্কুলে পাঠাবেন, দ্বিগুণ লাভ সঙ্গে দেবেন !

সুস্বাদ + পুষ্টি দেয় বনি মিক্স।

সেরা পুষ্টি যোগালেন মানে বাচ্চার প্রতি আপনার অর্ধেক দায়িত্ব সারলেন। হ্যাঁ, আপনার বাচ্চাকে রোজই দিন দু' রকম লাভদায়ক বনি মিক্স। এতে আছে মুখরোচক আপেল, আম, খেজুর, কিশমিশ ও বাদাম, আর বাছাইকরা খাদ্যশস্য – গম, চাল ও ভুট্টা। অর্থাৎ বনি মিক্স থেকে আপনার বাড়ন্ত বাচ্চা পায় বাড়তি পুষ্টি, যা তার দরকার !

আর তৈরী করাও কত সোজা !

রান্নার ঝামেলা নেই।

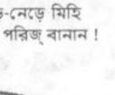

শুধু – একটি কাঁচের বাটিতে প্রয়োজনমতো বনি মিক্স ঢালুন ... ওতে আগে থেকে ফোটানো দুধ মেশান আর আলতো নেড়ে-নেড়ে মিহি ক্রীমওয়ালা মালাইয়ের মত পরিজ্ বানান !

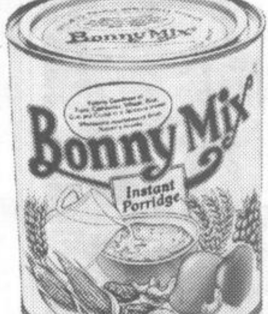

গ্ল্যাক্সো সুস্বাস্থ্যের উৎস !

GL/3/89-R-BEN

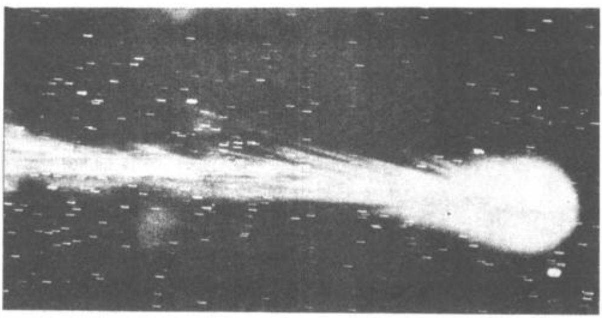

মধ্যযুগেই তিনি বলেছিলেন হ্যালির ধূমকেতুর কথা

শুধু ইউরোপ, আমেরিকার ইতিহাসের ঘটনাই নয়, এশিয়া এবং আফ্রিকার বহু ঐতিহাসিক মোড় ফেরানো ঘটনাবলীর কথাও বলে গেছেন তিনি। তিন-তিনটি শতাব্দী জুড়ে কীভাবে এগোবে এই বিশ্ব, তার প্রতিটি পদক্ষেপের উল্লেখ হয়তো পাওয়া যাবে না, তবে রাজনৈতিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা তিনি অনেক উল্লেখ করেছেন। এশিয়া মহাদেশের, বিশেষত মধ্যপ্রাচ্যের দিকে নস্ট্রাডামুস খুব সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিলেন। সেই অঞ্চলের মাটিতে সপ্তদশ শতক থেকে বিংশ শতক পর্যন্ত বিভিন্ন ঘটনা, যুদ্ধবিগ্রহ কিছুই তাঁর নজর এড়ায়নি।

খ্রিস্টধর্মের প্রতি অগাধ বিশ্বাসের কারণেই নস্ট্রাডামুসের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল এই যে, মানবসভ্যতায় এমন রক্তপিপাসু প্রতাপশালী ব্যক্তিত্ব তাঁর আধিপত্য বিস্তার করতে আসবেন, যিনি এই প্রাণচঞ্চল পৃথিবী ও মানবকল্যাণ বিরোধী। কিন্তু ঈশ্বর ও যিশুর কৃপায় শেষ পর্যন্ত ফিরে আসবে শান্তি। এই একনায়ক স্বেচ্ছাচারী শাসকদের তিনি মানুষ এবং খ্রিস্টবিরোধী হিসেবে চিহ্নিত করতে চান। তাই এঁদের নাম দেন 'অ্যান্টিক্রাইস্ট' বা 'খ্রিস্টবিরোধী'। নস্ট্রাডামুস বলে গেছেন যে, মানবসভ্যতা মোট তিনজন এরকম খ্রিস্টবিরোধীর সম্মুখীন হবে। প্রতিক্ষেত্রেই সারা পৃথিবী জুড়ে দেখা দেবে ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ, মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক ভেঙে যাবে, হিংসা আর উন্মত্ত হত্যালীলায় পৃথিবী ভরে উঠবে। নিরীহ মানুষ হাজারে-হাজারে প্রাণ দেবে, যারা বেঁচে থাকবে তাদের জীবন হবে দুর্বিষহ। চারদিক থেকে ভেসে আসবে কান্না, নৃশংস ঘটনাও ঘটবে প্রচুর। প্রথম দুই ক্ষেত্রে যদিও শেষ পর্যন্ত শেষ হবে এই কালান্তক অবস্থা, শান্তি স্বস্তি ও আনন্দকে আবার ফিরিয়ে আনবে মানুষ, তাদের বেঁচে থাকার স্বার্থে। কিন্তু, তৃতীয় অ্যান্টিক্রাইস্ট, যিনি নিয়ে আসবেন ধ্বংসময় অবস্থা,

তাঁর অবসানের পর? সত্যিই সে-বিষয়ে খুব আশাপ্রদ কথা বলেননি নস্ট্রাডামুস। তৃতীয় এই ব্যক্তি ও তাঁর সময়ের কথা যদিও সেঞ্চুরির ভবিষ্যদ্বাণী থেকে কিছু-কিছু পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁর পরের পৃথিবী কেমন হবে সে-বিষয়ে বিশেষ কিছু বলে যাননি প্রফেট নস্ট্রাডামুস। তিনি যদি সম্পূর্ণ করে যেতে পারতেন সেঞ্চুরির দশম খণ্ড, তা হলে এ-বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ অঙ্গুলিনির্দেশ পেয়ে যেতাম আমরা। তবে, অন্য যেসব ভবিষ্যদ্বাণী পাওয়া যাচ্ছে যেগুলি বিশ শতকের শেষ

সারা বিশ্বে কৌতূহল

নস্ট্রাডামুসের সেঞ্চুরিগুলিকে বহুদিন থেকেই বিশ্লেষজ্ঞরা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এই ধরনের নিয়মিত গবেষণায় আগামী নানা ঘটনার প্রতি আলোকপাত করা হচ্ছে। ব্যাখ্যাকারীরা এক-একজন এক-একরকমভাবে ভিন্ন-ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োগ করে চলেছেন সেঞ্চুরির বিভিন্ন কবিতা। এইসব ব্যাখ্যাসংবলিত বিভিন্ন বইও সারা পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে বিভিন্ন ভাষায় নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। এঁদের মধ্যে বর্তমানে এরিকা চিটহ্যাম এ-ধরনের ব্যাখ্যায় সবচেয়ে বিখ্যাত। দীর্ঘকাল ধরে তিনি নস্ট্রাডামুসের ভবিষ্যদ্বাণী ব্যাখ্যা করে চলেছেন এবং দেখা যাচ্ছে যে, অনেক ঘটনার ক্ষেত্রে তাঁর পূর্ব-বর্ণিত অঙ্গুলিনির্দেশ সঠিক এবং অভ্রান্ত। তার ফলও হয়েছে গুরুতর। 'মোর প্রফিসিস অব নস্ট্রাডামুস' নামক বইয়ে শ্রীমতী চিটম্যান লিখেছেন যে, পৃথিবীর বহু দেশের রাষ্ট্রপ্রধানরাই তাঁর কাছে উদ্‌গ্রীব প্রশ্ন পাঠাচ্ছেন তাঁদের দেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নস্ট্রাডামুস কোনও কথা বলে গেছেন কি না। আসলে তাঁরা জানতে চান কোনও দুর্ঘটনা বা যুদ্ধ-বিগ্রহ অথবা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে চলেছে কিনা সেই দেশ, সেই রাষ্ট্রনেতার নিজের ভবিষ্যৎই বা কী, নস্ট্রাডামুস সে-সম্পর্কে কিছু বলে গেছেন কি না, এ-কথা জানতে চান তাঁরা। এরিকা চিটহ্যাম কোনও দেশেরই নাম করেননি, কারণ এই ঘটনাটি যাকে বলে 'টপ-সিক্রেট'। শুধু এটুকু বলেছেন যে, ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা বা এশিয়া নয়, এমনকী, মধ্যপ্রাচ্যের কোনও-কোনও জাঁদরেল রাষ্ট্রশাসকও পত্র প্রেরকদের মধ্যে আছেন।

ছবি : দেবাশিস দেব

নষ্ট্রাডামুস বলেছেন অদ্ভুত এক যানের কথা

উল্লেখ করেছিলেন রকেটের কথা

দশক সংক্রান্ত, সেগুলি যথেষ্ট আশাজনক নয় । এমন কথাও আকারে-ইঙ্গিতে বলে গেছেন নষ্ট্রাডামুস যার ব্যাখ্যা করলে বোঝা যায় একবিংশ শতকে মানব অস্তিত্ব আদৌ বিলুপ্ত হয়ে যাবে না, এমন কথা জোর দিয়ে বলতে পারছেন না তিনি । হিটলার সম্পর্কে সরাসরি খ্রিস্ট-বিরোধিতার প্রতীক এনেছিলেন নষ্ট্রাডামুস ; যখন তিনি লিখেছিলেন ষষ্ঠ খণ্ডের একটি সূত্রে, 'জার্মানির ক্ষমতামত্ত সেই প্রধান শাসক/যাঁর চিহ্ন বাঁকানো ক্রস তিনি/ কেবল যুদ্ধের উপাসক ।' বাঁকানো ক্রসচিহ্ন বা ক্রুকেড ক্রস বলতে নষ্ট্রাডামুস ইঙ্গিত করেছেন স্বস্তিকাচিহ্নের দিকে, বলতে চাইছেন যুদ্ধোন্মাদ হিটলার প্রকৃতপক্ষে খ্রিস্টবিরোধী ! মানবকল্যাণ তাঁর ধর্ম নয় । কিন্তু, তৃতীয়জনকে খুঁজে নেওয়া আজ অত সহজ নয়, কেননা নষ্ট্রাডামুসের মতে এই মহাপ্রলয়ের নায়ক আবির্ভূত হবেন লোকসমক্ষে শেষ দশকের মাঝামাঝি বা প্রথম দিকে । সেইদিন যেহেতু এখনও দূরে, তাই নষ্ট্রাডামুসের সত্যতা যাচাই করা সম্ভব নয় । এখন শুধু অপেক্ষা করতে পারি আমরা, যে-কোনও ঘটনা ঘটলে মিলিয়ে দেখতে পারি নষ্ট্রাডামুসের ভবিষ্যদ্বাণীর সঙ্গে । নষ্ট্রাডামুসের মতে, তৃতীয় খ্রিস্টবিরোধী দেখা দেওয়ার পূর্বাভাস হিসেবে ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে হ্যালির ধূমকেতুর আবির্ভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । এর পরেই সারা পৃথিবী জুড়ে দেখা দেবে যুদ্ধের ঘনঘোর ছায়া । বিশেষত মধ্য প্রাচ্যে যুদ্ধের পর যুদ্ধ শুরু হবে । ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে যে হ্যালির ধূমকেতু দেখা দেবে, সে-কথা জানিয়ে গেছেন নষ্ট্রাডামুস । তারপর সেই রাজনৈতিক নেতার আবির্ভাব ঘটবে । এই অধিপতির বিরুদ্ধে পৃথিবীর দুই বৃহৎ শক্তি একত্র হয়ে যুদ্ধে নামবে, এক ক্ষণস্থায়ী শান্তিচুক্তি হবে উভয়পক্ষের, আবার শুরু হবে যুদ্ধ, এমন ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন নষ্ট্রাডামুস । কিন্তু, তাই বলে কি হতাশায় মুহ্যমান হয়ে পড়ব আমরা ? সমস্ত মানবসমাজ কি অপেক্ষা করবে নষ্ট্রাডামুস বর্ণিত সেই অন্তিমক্ষণের জন্য ? সে-কথা অবশ্য মেনে নেওয়া যায় না । বরং নষ্ট্রাডামুসের এই ভবিষ্যদ্বাণীকে আমরা প্রাচীন গ্রিস ও রোমের প্রথা অনুযায়ী বিচার করতে পারি । সেকালে ভবিষ্যদ্বাণীকে মনে করা হত আগামী দুঃসময়, দুর্ঘটনা সম্পর্কে পূর্ব-সাবধানবাণী । মানুষ যাতে সেই সম্পর্কে আগে থেকে সচেতন হয়ে যায়, এড়াতে পারে দুঃসময় । নষ্ট্রাডামুসের ভবিষ্যদ্বাণীকে যদি আগাম সাবধানতাসূচক তথ্য হিসেবে গ্রহণ করা যায়, তবে পৃথিবীর শান্তিকামী আশাবাদী মানুষ এই অবস্থার বিরোধিতা করবেন, —এটাই কাম্য । মানব ইতিহাসে যুদ্ধ শেষ কথা নয়, শেষ পর্যন্ত শান্তি আর সততাই যে জয়ী হয়, সেটা আজ প্রমাণিত ।

অনেক পণ্ডিত অবশ্য মনে করেন নষ্ট্রাডামুসের ভবিষ্যদ্বাণীগুলি সর্বদা সত্য হবে এ-কথাও ঠিক নয় । তিনি যেমন বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে সফল, তেমনই কয়েকটি ক্ষেত্রে বিফলও হয়েছেন । অনেকে নষ্ট্রাডামুসের সময় সূচনা সম্পর্কেও সন্দিহান । তাঁদের মতে, অনেক ক্ষেত্রেই ব্যাখ্যার মাধ্যমে সেটাকে সত্য করে তোলা হচ্ছে । তবে এ-কথাও তাঁরা স্বীকার করেছেন যে, নষ্ট্রাডামুসকে হালকা করে দেখার কোনও অর্থ নেই । তিনি নিঃসন্দেহে এক স্মরণীয় প্রতিভা ।

ধারাবাহিক উপন্যাস

কালাপাহাড়

সমরেশ মজুমদার

দোতলার যে ঘরটিতে হরিপদবাবু ছিলেন তার দরজায় তালা দেওয়া। হোটেলে কোনও লোকজন নেই। এমনকী কর্মচারীদেরও দেখা যাচ্ছে না। রায়বাবুর পকেটে চাবি ছিল। তিনিই দরজা খুললেন। জানলা বন্ধ। তাই আলো জ্বালা হল প্রথমে। শ্রীকান্ত বকসি জানলা খুলে দিলেন। মাঝারি আকারের ঘর। মাঝখানে একটা ডাবলবেড, চাদর ছাড়া। টেবিলে কিছু কাগজপত্র, ব্যাগ ছড়ানো আছে। অমলদা বললেন, "বডি নিয়ে যাওয়ার পর ভাল করে খুঁজে দেখা হয়েছে?"

রায়বাবু জিজ্ঞেস করলেন, "কী খুঁজব? ক্লু? কোনও দরকার নেই। লোকটা ওই দরজা দিয়েই ঢুকেছিল। হরিপদ সেন বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে ছিলেন। চুপচাপ ভেতরে ঢুকে সোজা ওঁর পিঠে দশ ইঞ্চি শার্প সরু ছুরি বসিয়ে দিয়েছে। কাজ শেষ করে ওই দরজা দিয়েই চলে গেছে।"

অমলদা চট করে শ্রীকান্ত বকসির দিকে তাকালেন। তিনি তখন দরজায় দাঁড়িয়ে। অমলদা বললেন, "এ-কথা তো আপনি আমাকে জলপাইগুড়িতে বলেননি?"

"আমি তো তখন পুরো ঘটনাটা জানতাম না।"

অমলদা একটু ভাবলেন, "ভদ্রলোক, মানে খুনি, ওই দরজা দিয়ে ঢুকলেন কী করে? হরিপদবাবু কি দরজা বন্ধ করে বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়েছিলেন?"

"ঠিক তাই।" রায়বাবু বললেন, "অনেক লোক হোটেলে এলেও কেয়ারলেস হয়ে থাকে।"

মাথা নাড়লেন অমলদা, "হরিপদবাবুর সঙ্গে মাত্র কয়েক মিনিটের জন্য আলাপ হলেও আমি জোরগলায় বলতে পারি, তিনি দরজা খুলে ওইভাবে শুয়ে থাকার মানুষ নন।"

রায়বাবু একটু বিরক্ত হয়েই জিজ্ঞেস করলেন, "তা হলে খুনি ঢুকল কী করে?"

"সেটা নিয়ে একটু ভাবনাচিন্তা করা যেতে পারে।" কথাগুলো বলতে-বলতে অমলদা পুরো ঘরটা একবার পাক মেরে এলেন। তাঁর নজর ঘরের মেঝের ওপর ছিল। শেষ পর্যন্ত তিনি দেওয়াল-আলমারিটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। কিছুক্ষণ দেখে

জিজ্ঞেস করলেন, "এ ঘরের সমস্ত হাতের ছাপ নিয়ে নিয়েছেন মিস্টার রায় ? নিলে আমি আলমারিটা খুলতে পারি। আমাকে যখন একজন পার্টি করেছেন তখন এটুকু সাবধানতা অবলম্বন করতেই হচ্ছে।"

রায়বাবু বললেন, "ফিঙ্গার প্রিন্টের লোককে সন্ধের আগে পাওয়া যাচ্ছে না।"

অমলদা বললেন, "তা হলে রুমাল ব্যবহার করছি।"

পকেট থেকে সাদা রুমাল বের করে ডান হাতে নিয়ে আড়ালে আঙুল ঢেকে আলমারি খুললেন অমলদা। হ্যাঙারে একজোড়া শার্ট-প্যান্ট ঝুলছে। নীচের তাকে একটা খোলা ফাইল। ফাইলটা সম্ভবত সাদা ফিতেয় বাঁধা ছিল। ফিতেটা ছেঁড়া। হাঁটু গেড়ে বসে ফাইলের কাগজপত্র দেখতে-দেখতে অমলদা বললেন, "একেবারে লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে গেছে। অর্জুন, তুমি ততক্ষণে বাথরুমটা দেখে এসো।"

রায়বাবুকে অমলদার কাছে গিয়ে দাঁড়াতে দেখে অর্জুন বাঁ দিকের দরজা ঠেলে বাথরুমে ঢুকল। শুকনো বাথরুম। একটা নীল তোয়ালে ঝুলছে। আয়নার নীচে নতুন সাবানকেসে অল্প ব্যবহার করা সাবান ছাড়া আর কিছু নেই। বাথরুমে কোনও সন্দেহজনক জিনিস চোখে পড়ল না। সে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে দেখল অমলদা টেবিলের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। টেবিলের দু'ধারে দুটো চেয়ার। একটা সিনেমার ম্যাগাজিন পড়ে আছে। মাঝখানের অ্যাসট্রেতে গোটা দুয়েক সিগারেটের টুকরো পড়ে আছে। অমলদা বললেন, "মিস্টার রায়, পোস্টমর্টেম যিনি করবেন তাঁকে বলবেন যেন পরীক্ষা করে দ্যাখেন হরিপদবাবুর সিগারেটের নেশা ছিল কি না। এটা খুব কড়া সিগারেট। শখে পড়ে যারা সিগারেট খায়, তাদের পক্ষে খাওয়া সম্ভব নয়।"

রায়বাবু অ্যাসট্রেটাকে সযত্নে সরিয়ে রাখলেন। অর্জুন দেখল ভদ্রলোকের চোখ-মুখের পরিবর্তন হয়েছে। বেশ সম্ভ্রমভাব ফুটে উঠেছে। টেবিলে আর কিছু পেলেন না অমল সোম। কিন্তু টেবিলের নীচে ঝুঁকে কিছু-একটা দেখেই সোজা হলেন। চারপাশে আর-একবার নজর বুলিয়ে বললেন, "আপনি বললেন এ-ঘরের কোনও জিনিসে হাত দেওয়া হয়নি, তাই না ?"

"নিশ্চয়ই।" রায়বাবু মাথা নাড়লেন।

"হরিপদবাবুর চটি কিংবা জুতো কোথায় ?"

এতক্ষণে খেয়াল হল অর্জুনেরও। এতক্ষণ শুধু সে লক্ষ করছিল খুনি কোনও ক্লু রেখে গিয়েছে কি না। সে-কারণেই হরিপদবাবুর ব্যবহৃত জিনিসের প্রতি নজর ছিল না।

ঘরের কোথাও ভদ্রলোকের চটি বা জুতো খুঁজে পাওয়া গেল না।

অমলদা বললেন, "ব্যাপারটা তো খুবই অস্বাভাবিক। খুনি ওঁকে খুন করে যেতে পারে কিন্তু চটি বা জুতো নিয়ে যাবে কেন ? গতকাল আমি হরিপদবাবুর পা দেখেছি। এমন কিছু মূল্যবান বস্তু ছিল না। আর ভদ্রলোক নিজে ওই প্রয়োজনীয় জিনিস দুটো বাইরে ফেলে দিয়ে বিছানায় শুয়ে থাকবেন এটা ভাবা যাচ্ছে না।"

রায়বাবু বললেন, "সত্যি তো, ওগুলো গেল কোথায় ?"

অমলদা বললেন, "আপনার লোকজনকে বলুন একটু খুঁজে দেখতে। এই হোটেলের আশেপাশে পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। কিন্তু শিলিগুড়ি শহরের ডাস্টবিন বা রাস্তা থেকে যারা বাতিল জিনিসপত্র কুড়োয়, তাদের জানিয়ে রাখুন।"

অমলদা ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ামাত্র অন্যান্যরা তাঁকে অনুসরণ করল। বারান্দায় দাঁড়িয়ে অমলদা জিজ্ঞেস করলেন, "হোটেলের

কর্মচারীদের জেরা করে কিছু জানতে পারলেন ?"

রায়বাবু মাথা নাড়লেন, "ডিটেলসে জিজ্ঞেস করিনি। এমনিতে সবাই বলছে কেউ কিছু জানে না।"

"আমি একটু কথা বলার সুযোগ পাব ?"

"তা হলে তো আপনাকে হোটেলে যেতে হয়।"

"যেতে তো হবেই। আপনি আমাদের জেরা করবেন বলেছিলেন।"

রায়বাবু জিভ বের করলেন, "ছি-ছি। ওভাবে বলবেন না। হরিপদবাবুকে জীবিত অবস্থায় আপনি দেখেছিলেন, উনি হোটেলের ম্যানেজারকে জিজ্ঞেস করেছিলেন কীভাবে জলপাইগুড়িতে গিয়ে আপনাকে মিট করবেন, তাই আপনার একটা স্টেটমেন্ট নেওয়া আমার কর্তব্য।"

"সেটা অবশ্যই নেওয়া উচিত।"

হোটেলটিকে আবার তালাবন্ধ করে রায়বাবু ওঁদের নিয়ে জিপে উঠলেন। রাস্তায় কোনও কথা হল না। থানায় গিয়ে রায়বাবু ওঁদের সমাদর করে বসালেন। নিজের চেয়ারে বসেই পুলিশি গলা ফিরে পেলেন যেন, "হরিপদ সেনকে আপনি আগে চিনতেন ?"

"না। কস্মিনকালেও নয়।" অমলদা মাথা নাড়লেন।

"উনি সেই কলকাতা থেকে আপনার কাছে কেন এলেন ?"

"গুপ্তধনের খোঁজে।"

"মানে ?" রায়বাবুর মুখ হাঁ হয়ে গেল।

"ওঁর পূর্বপুরুষ কালাপাহাড়ের সহচর ছিলেন। কালাপাহাড় উত্তর বাংলার কোথাও অনেক সোনা-হিরে মাটিতে পুঁতে রেখেছিলেন। ওঁর পূর্বপুরুষ সেটা জানতেন। হরিপদবাবু চেয়েছিলেন আমরা সেটা উদ্ধার করে দিই। এই অনুরোধই তিনি করেছিলেন।"

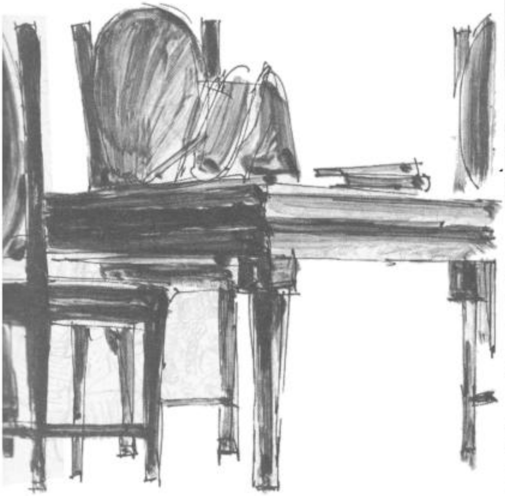

"কোথায় ওগুলো পোঁতা হয়েছিল তিনি আপনাকে জানিয়েছিলেন ?"

"না। তিনি জানতেন না।"

"স্ট্রেঞ্জ! উত্তর বাংলার কোথায় খুঁজবেন আপনি? পাগল নাকি?"

"তবু আমি কেসটা নিয়েছিলাম। এ-ব্যাপারে ভদ্রলোক বেঁচে থাকলে সাহায্য পেতাম।"

"দেখুন মিস্টার সোম, আপনার এই গল্প কেউ বিশ্বাস করবে না।"

"প্রথমত গল্প নয়, ঘটনা। বিশ্বাস করানোর দায়িত্ব আমার নয়।"

"বেশ। তারপর কী হল ?"

"আমি ওঁকে আজ দেখা করতে বলেছিলাম।"

"উনি শিলিগুড়িতে থাকতে গেলেন কেন? জলপাইগুড়িই তো ভাল ছিল।"

"সে-কথা আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম। ভদ্রলোক হেসে বলেছিলেন শিলিগুড়িতেই উনি ভাল থাকবেন। মনে হচ্ছে, মানে এখন অনুমান করছি, শিলিগুড়িতে কারও সঙ্গে দেখা করবেন ঠিক ছিল, যেটা আমাকে বলেননি।"

"কার সঙ্গে ?"

"সম্ভবত যে লোকটি ওঁকে খুন করেছে তার সঙ্গেই অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল।"

হঠাৎ রায়বাবুর যেন কিছু মনে পড়ল। চট করে উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "হরিপদবাবুর পূর্বপুরুষ কার সহচর বললেন ?"

অমলদা বললেন, "কালাপাহাড়।"

"অদ্ভুত ব্যাপার? কালাপাহাড় মানে সেই ঐতিহাসিক চরিত্র ?"

"হ্যাঁ।"

রায়বাবু উঠে একটা আলমারির পাল্লা খুললেন। বাঁ দিকের তাক থেকে একটা খাম বের করে তা থেকে একটা কাগজ টেনে আনলেন। বেশ রহস্যময় মুখ করে এগিয়ে এসে কাগজটাকে টেবিলের ওপর মেলে ধরলেন।

একটা প্যাডের পাতার গায়ে রক্ত শুকিয়ে রয়েছে। পাতাটা কোঁচকানো। বোঝা যাচ্ছে ওই কাগজ দিয়ে কিছু মোছা হয়েছিল। প্যাডের পাতায় কেউ অনেকবার 'কালাপাহাড়' শব্দটা লিখে গেছেন নানান ঢঙে। তার ওপর শুকনো রক্ত চাপা পড়েছে।

অমলদা জিজ্ঞেস করলেন, "এই কাগজটাকে কোথায় পাওয়া গিয়েছে ?"

"হরিপদবাবুর শরীরের ওপরে।"

"আপনি তখন যে বললেন ঘরের কোনও জিনিস সরানো হয়নি ?"

"এটাকে জিনিসের মধ্যে ধরিনি। আমি হরিপদবাবুর ব্যবহৃত জিনিসের কথা বলেছিলাম।"

"ছুরিটা কোথায় ?"

"ছুরি ?"

"যেটা দিয়ে ওঁকে খুন করা হয় ?"

"সেটা তো খুনি নিয়ে গেছে। মনে হচ্ছে এই কাগজটা দিয়েই ছুরি মুছেছে।"

"এখনও পোস্টমর্টেম হয়নি। আপনি কী করে তখন বললেন দশ ইঞ্চির ছুরি ছিল ?"

"এতদিন পুলিশে চাকরি করছি, উন্ড দেখে আন্দাজ করতে পারব না ?"

চুপ করে রইলেন অমলদা খানিক। তারপর বললেন, "প্যাডের কাগজটা অবশ্যই হরিপদবাবুর। খুনি ছুরি মুছবে প্ল্যান করে পকেটে কাগজ নিয়ে আসবে না। কিন্তু ঘরের কোথাও আমি প্যাড দেখতে পাইনি। সেটা গেল কোথায় ?"

রায়বাবু মাথা নাড়লেন, "ঠিক কথা! এটা আমার মাথায় আসেনি।"

শ্রীকান্ত বকসি এতক্ষণ চুপচাপ শুনছিলেন। এবার বললেন, "আপনাকে আমি আগেই বলেছিলাম অমলবাবুর এ-ব্যাপারে দারুণ মাথা খোলে!"

অমলদা হাত নাড়লেন, "আমাকে কি আর কোনও প্রশ্ন করবেন ?"

"না। তবে, হ্যাঁ। আপনি কালাপাহাড়ের নাম বললেন। ঐতিহাসিক চরিত্র। কিন্তু এই কাগজে সেই নামটা লেখা থাকবে কেন ?"

"হয়তো হরিপদবাবু লিখেছিলেন অন্যমনস্ক হয়ে।" অমলদা হাসলেন, "মাথায় যেটা ঢোকে সেটা আমরা অনেকেই অন্যমনস্ক অবস্থায় কলমে ফুটিয়ে তুলি। তবে দেখতে হবে ওই কাগজের রক্ত এবং হাতের লেখা হরিপদবাবুর কি না!"

"রক্তটা ওঁর কি না বের করতে অসুবিধে হবে না। হাতের লেখা মেলাব কী করে ?"

"হোটেলের খাতায় নিশ্চয়ই ওঁর হস্তাক্ষর পাওয়া যাবে। তাকিয়ে দেখুন বাংলার সঙ্গে ইংরেজি অক্ষরেও কালাপাহাড় লেখা হয়েছে। ক্যাপিটাল লেটারে যখন নয় তখন লেখাতে কিছুটা মিল পাওয়া যাবেই। যাক, এবার আমাকে হোটেলের কর্মচারীদের সঙ্গে কথা বলার ব্যবস্থা করে দিন।" অমলদা উঠে দাঁড়ালেন। (ক্রমশ)

ছবি সুব্রত চৌধুরী

সেদিন সকালে

শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়

রাজা চতুর্দশ লুইকে সভায় ঢুকতে দেখে সবাই হইহই করে উঠলেন।

কিন্তু এ কী! সিংহাসনে না বসে রাজা গিয়ে দাঁড়ালেন তার বাজুতে হেলান দিয়ে! কেন? সবাই মুখ-চাওয়াচাওয়ি করলেন। কিন্তু কেউ কিছুই ঠিকমতো বুঝে উঠতে পারলেন না।

রাজামশাই সভার কাজ শুরু করলেন দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েই। ক'দিন ধরেই রাজা এমনই করছেন। কী যেন হয়েছে তাঁর। তিনি যেন কেমন গম্ভীর হয়ে আছেন।

শেষে মন্ত্রী একদিন গেলেন রানির কাছে। গোপনে। রাজার এমন ভাবান্তরের কারণ কী তাই জানতে। কথাটা বলতেই রানিমা চমকে উঠলেন। রাজা চতুর্দশ লুই ভুগছেন কিনা একটা কঠিন রোগে, আর তাঁর এখনও পর্যন্ত কোনও চিকিৎসাই হয়নি! ডেকে পাঠানো হল দেশের সেরা ডাক্তারবাবুদের।

সেরা ডাক্তারবাবু বলতে তখন বোঝাত কেবল ফিজিশিয়ানদেরই। সার্জেনদের নয়। কেন, সার্জেনদের নয় কেন? সে অনেক

কথা। যা বুঝতে হলে ১৫ শতকে ফ্রান্সের চিকিৎসা-ব্যবস্থা কেমন ছিল তা জানতে হবে। ফ্রান্সে তখন চিকিৎসা করতেন তিনরকমের চিকিৎসক। ফিজিশিয়ান, সার্জেন আর বারবার ফিজিশিয়ান অর্থাৎ ক্ষৌরকার-চিকিৎসক। ফিজিশিয়ান আর সার্জেন হতে দরকার হত মেডিকেল কলেজে পড়ে পাশ করার। ফ্রান্সে সেই সময়ে একটাই মেডিকেল কলেজ। সেন্ট কেমি।

দেশের সম্ভ্রান্ত মানুষদের চিকিৎসা করতেন ফিজিশিয়ানরা। আর সাধারণ গরিব-দুঃখীদের ক্ষৌরকার চিকিৎসকরা। সাধারণরা যে ফিজিশিয়ানদের কাছে যাবে তার সাধ্য কী! ফি'জ ছিল আকাশছোঁয়া! তা ছাড়া ফিজিশিয়ানরা ছিলেন ভারী নাক-উঁচু। সাধারণের ডাকে মোটেই সাড়া দিতেন না। সে তুলনায় ক্ষৌরকাররা বরং ছিলেন ভাল। গরিবের বন্ধু। ভগবান। ডাকলেই সাড়াও মিলত। তবে সাধারণের মধ্যে ক্ষৌরকারদের অত প্রতিপত্তির আসল কারণটা কিন্তু ছিল অন্য। ইউরোপে তো তখন প্রায়ই দেখা দিত মহামারী। কলেরা, প্লেগ, বসন্ত। যখন ওই ফিজিশিয়ান আর সার্জেনরা পালাতেন দেশ ছেড়ে, সাধারণদের প্রাণ বাঁচাতেন ওই ক্ষৌরকাররাই। পরিণামে তাঁরাই তখন হয়ে উঠেছিলেন সবার ভগবান। একমাত্র ভরসা।

চিকিৎসা করে প্রচুর উপার্জনও করতেন ওই ক্ষৌরকার চিকিৎসকরা। তাঁরা তখন রোজগার করতেন নানাভাবে। হাসপাতালে মৃতদের পোস্টমর্টেম করে রোগনির্ণয়ের কাজে সহায়তা করে, বানর, শূকর. ইত্যাদি জীবের ব্যবচ্ছেদ করে ডাক্তারবাবুদের অ্যানাটমি শেখায় সহায়তা করে। নিজে হাতে ওসব কাজকে পাশ-করা ডাক্তারবাবুরা অত্যন্ত অসম্মানজনক জ্ঞান করতেন।

ডাক্তারি করে পেট চলত না তখন কেবল সার্জেনদের। তাঁদের কেউই তখন তেমন গ্রাহ্য করত না। ওঁদের কাজগুলোই ছিল যে ভারী নোংরা। ফোড়া কাটা, গলা-পচা হাত-পা কেটে বাদ দেওয়া, ক্যাথিটার দিয়ে শৌচকাজ করানো। খুব ভয়ও পেত ওঁদের সবাই।

তবে ক্ষৌরকার চিকিৎসকরা তখন সবচেয়ে বেশি আয় করতেন রাজার কাছ থেকে, অনুদান আদায় করে।

হ্যাঁ, এই অনুদান পাওয়ার ব্যাপারটাও বেশ মজার।

ফ্রান্স তো সবে প্রগতিশীল হয়ে উঠতে শুরু করেছে। তার দিকে-দিকে গজিয়ে উঠতে শুরু করেছে কলকারখানা, বসছে নতুন-নতুন মেশিন, আবিষ্কার হচ্ছে যন্ত্রপাতি। ফলে পুরনো ব্যবসায়ীরা মার খেতে শুরু করেছে। তাদের বাঁচাতেই রাজা তখন জারি করেছিলেন এক নতুন আইন। বলেছিলেন, যাদের ব্যবসা আর চলছে না বলে মনে হচ্ছে, পেট চালাতে কষ্ট হচ্ছে, তারা যেন সব সঙ্ঘবদ্ধ হয়, নিজেদের নামে কম্পানি খোলে। কারণ, রাজা দেশের দরিদ্রদের জনে-জনে কোনও দান পাঠাবেন না। তিনি দান পাঠাবেন তাদের কম্পানির নামে। যা তারা তাদের নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেবে।

ফ্রান্সে তখন এরকম অনেক কম্পানি গজিয়ে উঠেছিল। মেডিকেল কলেজ খোলার পর, জাত ব্যবসা খোয়াবার ভয়ে সেখানে ক্ষৌরকাররা একটা কম্পানি খুলেছিলেন। 'বারবার কম্পানি'।

কিন্তু সার্জেনরা তা বলে কোনও কম্পানি খোলেননি। হাজার হোক শিক্ষিত সম্প্রদায় বলেই তাঁদের অমন ভাবতে বোধ হয় মর্যাদায় ধাক্কা লেগেছিল। তাই ওইসব দান নেওয়ার মধ্যে না গিয়ে, তাঁরা তখন পেট চালাতে গিয়ে যোগ দিয়েছিলেন ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানির জাহাজের চাকরিতে। সেও ছিল এক অদ্ভুত চাকরি। নামেই মেডিকেল অফিসার। কিন্তু আসলে তাঁদের কাজ ছিল সেখানে যাত্রীদের চুল-দাড়ি কামানো। আর কালেভদ্রে কারও অসুখটসুখ করলে তার চিকিৎসা করা।

আশ্চর্যের কথা, সার্জেনদের এত দুঃখ দেখেও ডাক্তারি পাশ করে তবুও অনেকেই চাইতেন সার্জেন হতে। কারণ হঠাৎ-হঠাৎ কোনও মরণাপন্ন রোগীকে অপারেশন করে বাঁচিয়ে দিয়ে তাঁদের কেউ-কেউ তখন দেশের মধ্যে খুব বিখ্যাত হয়ে পড়তেন। দেখা যেত, তিনি যেন হঠাৎই হয়ে পড়েছেন দেশের এক নম্বর মানুষ। গ্রেট হিরো। কিন্তু একদিন কে কবে হিরো হবেন বলে রোজ-রোজ তো আর পেটে কিল মেরে পড়ে থাকা যায় না। তাই সার্জেনরাও শেষ পর্যন্ত তাঁদের আত্মসম্মান নিয়ে বেঁচে থাকতে পারেননি। তাঁদেরও একদিন সাহায্যের জন্য গিয়ে দাঁড়াতে হয়েছিল ওই রাজার কাছেই!

রাজা সব শুনেটুনে বললেন, "তা বলে তোমরা যেন আবার একটা নতুন কম্পানি খুলে বোসো না। তার চেয়ে তোমরা বরং গিয়ে যোগ দাও ওই ক্ষৌরকারদের সঙ্গে। ওদের কম্পানির নাম পালটে তার নতুন নাম দাও 'বারবার সার্জেন কম্পানি'।"

ব্যস, তাই হল। সার্জেনরা সব লজ্জা-সঙ্কোচ ভুলে এবার সত্যিই গিয়ে যোগ দিলেন ক্ষৌরকারদের সঙ্গে! একেই বলে ভাগ্য! একই কলেজে পড়ে, পাশ করে একদল হলেন দেশের গণ্যমান্য সম্ভ্রান্তদের চিকিৎসক, আর-একদল হলেন ক্ষৌরকারদের সহায়ক।

ওদিকে রাজাকে নিয়ে তো দেশের যত রথী-মহারথী ফিজিশিয়ানরা তখন হাবুডুবু খাচ্ছেন। হাজার চেষ্টা করেও রাজাকে তাঁরা আর কিছুতেই পারছেন না সুস্থ করে তুলতে। রাজার অবস্থার ক্রমেই অবনতি হচ্ছে। রাজপ্রাসাদ ডুবছে অন্ধকারে। রানির মুখে হাসি নেই। প্রজাদের মনে শান্তি নেই।

এমন সময় একদিন রাজদ্বারে এসে দাঁড়ালেন এক অদ্ভুতদর্শন বৃদ্ধ। ভাঙাচোরা চেহারা, চওড়া কপাল, লম্বা নাক।

"কী চাই ?" দ্বাররক্ষী প্রশ্ন করল।

"রাজদর্শন।" বৃদ্ধ উত্তর দিলেন।

"কিন্তু কে আপনি ?"

"আমি একজন সার্জেন। আমার নাম ডাঃ ফিলিক্স। এসেছি রাজার চিকিৎসা করতে।"

দ্বাররক্ষী তো তাই শুনেই ছুটল মন্ত্রীর কাছে। মন্ত্রী তখন ছিলেন রাজকক্ষে। খবরটা শুনেই তিনিও গিয়ে দাঁড়ালেন সার্জেন ফিলিক্সের মুখোমুখি। দেখে চিনতেও পারলেন সেই বৃদ্ধকে। বারবার সার্জেন কম্পানির একজন ডাকসাইটে চিকিৎসক। কিন্তু মুখে এমন ভাব দেখালেন যেন আগে কখনও দেখেননি ওঁকে। বললেন, "কী চাই আপনার ?"

বৃদ্ধ ফিলিক্সও বিনীতভাবে বললেন, "আজ্ঞে, আমি এসেছি রাজার চিকিৎসা করতে। আমি একজন সার্জেন। নাম..."

"বলেন কী আপনি ?" মন্ত্রী তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, "একজন সামান্য সার্জেন হয়ে আপনি এসেছেন কিনা রাজার চিকিৎসা করতে ? স্পর্ধা তো আপনার কম নয় !"

"কিন্তু রাজামশাই তো আমাদের সবার রাজা।" বৃদ্ধ দৃঢ় উত্তর দিলেন। "তা ছাড়া রাজার যা রোগ, তার সঠিক চিকিৎসাই তো হল সার্জারি। ফিজিশিয়ানদের সাধ্য কী রাজাকে ভাল করেন !"

"বটে !" মন্ত্রী হুঙ্কার দিয়ে উঠে বললেন, "রক্ষী, এই আহাম্মকটাকে এক্ষুনি বের করে দাও।"

"না, না, ওঁকে বের করে দেবেন না।" মন্ত্রীর উত্তেজিত কথার মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন রানিমা। বললেন, "আপনি ওঁকে ভেতরে নিয়ে যান। রাজামশাই ডাকছেন।"

সে কী ! রাজামশাই ডাকছেন একজন সার্জেনকে !

বেশ। তবে তাই হোক। মন্ত্রী এবার সার্জেন ফিলিক্সকে নিয়ে ঢুকলেন রাজকক্ষে। আর রাজা হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, "কার হুকুমে তুমি ওকে তাড়াচ্ছিলে ?"

"কেন ?"

"আমি আর তোমার কোনও 'কেন' শুনতে চাই না।" রাজা ফের হাঁক ছাড়লেন। বললেন, "ফিজিশিয়ানদের আমি অনেক সময় দিয়েছি। আর নয়। এবার আমি সার্জেনদের দিয়েই চিকিৎসা করাব।" সার্জেন ফিলিক্সকে কাছে ডেকে, তার হাত দুটি ধরে রাজা বললেন, "পারবেন তো আপনি আমাকে ভাল করতে ?"

"নিশ্চয়ই পারব।" সার্জেন ফিলিক্স ফের দৃঢ় গলায় উত্তর দিলেন। "সুযোগ পেলে কয়েকদিনের মধ্যেই আমি আপনাকে ভাল করে তুলব।"

"সত্যি ?" রাজা তো সার্জেন ফিলিক্সের কথা শুনে আনন্দে কেঁদে ফেললেন।

পরের দিনই খবর রটে গেল দেশের দিকে-দিকে। রাজার অপারেশন। দেশের মানুষজন ভয়ে সিঁটকে উঠল। কিন্তু এ কী, দেখা গেল অপারেশন করিয়ে রাজা সত্যিই ভাল হয়ে উঠেছেন। তাঁর নাকি আর কোনও

কষ্টই নেই। কী আনন্দ ! খবরটা শুনেই তো দেশ জুড়ে শুরু হল হুল্লোড়। উৎসব।

এবার রাজা আবার গিয়ে বসলেন সিংহাসনে। রাজসভা সেদিন লোকে লোকারণ্য। রাজাই আমন্ত্রণ জানিয়েছেন দেশের বহু মানুষকে। সেই ভিড়ের এক কোণে সার্জেন ফিলিক্সও এসে বসেছেন তাঁর দলবল নিয়ে, বিশেষ আমন্ত্রিত হিসেবে।

এমন সময় হঠাৎ শোনা গেল, রাজা নাকি আজ জারি করবেন এক নতুন আইন, তাঁর এই আরোগ্যলাভকে স্মরণীয় করে রাখতে। কিন্তু কী সেই আইন ? রাজসভায় পড়ে গেল হুড়োহুড়ি। সবাই চায় এগিয়ে বসতে। রাজাকে ভাল করে শুনতে।

রাজা বললেন, "এতদিন এ-রাজ্যে নিয়ম ছিল কেবলমাত্র একজন ফিজিশিয়ানই বহাল থাকবেন রাজবৈদ্য পদে। আজ থেকে আমি নতুন আইন জারি করছি। শুধু ফিজিশিয়ানই নন, রাজবৈদ্য পদে বহাল থাকবেন একজন সার্জেনও।"

সে কী! সার্জেন হবেন রাজবৈদ্য ? কিন্তু কে সেই সার্জেন ?

রাজা বললেন, "প্রথম যে সার্জেনকে আমি নিয়োগ করছি ওই পদে, তাঁর নাম সার্জেন ফিলিক্স।"

নিজের নাম শুনে বৃদ্ধ ফিলিক্স একেবারে আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠলেন। তাঁর বন্ধুরা তাঁকে জড়িয়ে ধরে আবেগে যেন সব ফেটে পড়তে চাইলেন।

কথাটা শুনে কিন্তু বিগড়ে গেলেন মন্ত্রী। রাজবৈদ্য। দেশের ফিজিশিয়ানরা। সবাই রাজাকে ধিক্কার দিয়ে বললেন, এ কী কাণ্ড রাজার ? শেষে একজন নগণ্য সার্জেন বসবেন রাজবৈদ্য পদে!

কিন্তু কী আর করা! রাজার আদেশ, সে তো আর অমান্য করা যাবে না। তবুও ফিজিশিয়ানরা সান্ত্বনা পেলেন এই ভেবে যে, ফিলিক্সের বয়স হয়েছে। যে-কোনওদিনই মারা যেতে পারেন। ততদিন না হয় অপেক্ষাই করা যাক।

ওদিকে বারবার সার্জেন কম্পানিতে তখন লেগে গেছে এক উৎসবের ধুম। এত বড় জয় তাঁদের জন্য অপেক্ষা করে আছে, তা তাঁরা স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি। ফলে তাঁরা আয়োজন করে ফেললেন সার্জেন ফিলিক্সের এক বিশাল সংবর্ধনা-সভা! ফিলিক্সও গিয়ে দাঁড়ালেন গলায় জয়মাল্য পরে, তাঁর জবাবী ভাষণ দিতে। বললেন, "আমি সত্যিই বড় খুশি হয়েছি দেশের গোঁড়া ফিজিশিয়ানদের, হারিয়ে দিয়ে, রাজার কাছ থেকে যোগ্য সম্মান

ছিনিয়ে এনে। কিন্তু তা বলে যেন ভাববেন না আপনারা, ফিজিশিয়ানদের সঙ্গে যুদ্ধ আমাদের শেষ হয়ে গিয়েছে। না, এখনও আমাদের অনেকদূর যেতে হবে। সেন্ট কেমিতে এখনও সার্জারির পাঠ দেওয়া হয় না। , সার্জেনদের সেখানে এখনও প্রবেশাধিকার নেই।"

ফিলিক্সের বক্তৃতা শুনে ফ্রান্সের সার্জেনরা ধিক্কারে ফেটে পড়লেন। সবই অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন, রাজবৈদ্য পদে যোগ দিয়ে সার্জেন ফিলিক্স কী করেন তাই দেখার জন্য!

কিন্তু কী আশ্চর্য! সার্জেন ফিলিক্স রাজবৈদ্য পদে যোগ দিতে না দিতেই রাজা চতুর্দশ লুই মারা গেলেন। তা হলে উপায়! সার্জেন ফিলিক্স পড়লেন দারুণ ফাঁপরে। এখন তাঁর যত মনোবাসনা তা হলে পূর্ণ হবে কী করে ?

শোনা গেল, নতুন রাজা, অর্থাৎ রাজা পঞ্চদশ লুই নাকি একজন দারুণ সার্জারি-ভক্ত মানুষ। সার্জেনদের ওপর নাকি তাঁর অগাধ আস্থা। কথাটা শুনেই তো ফিলিক্স মনে-মনে নেচে উঠলেন। ভাবলেন, যাক, এবার তা হলে তাঁর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতে মোটেই তেমন অসুবিধে হবে না!

কিন্তু এ কী! হঠাৎ একদিন সকালে শোনা গেল সার্জেন ফিলিক্সের মৃত্যু সংবাদ। আর তাই শুনেই বারবার সার্জেন কম্পানিতে নেমে এল শোকের ছায়া। অন্যদিকে মন্ত্রী আর দেশের যত ফিজিশিয়ান সবাই তখন আহ্লাদে আটখানা।

কিন্তু সে আর কতক্ষণ! শোনা গেল, রাজামশাই সার্জেন ফিলিক্সের জায়গায় ফের বহাল করেছেন আর-এক নতুন সার্জেনকে। তাঁর নাম মারেসকাল।

এই মারেসকালও ছিলেন এক ধুরন্ধর ব্যক্তি। তিনি রাজবৈদ্য পদে বহাল হয়েই শুরু করলেন রাজার কান ভাঙানো। ফিজিশিয়ানদের বিরুদ্ধে নানারকম আজেবাজে কথা বলে তাঁকে তাতিয়ে তুললেন।

সেন্ট কেমিতে এখনও ছাত্রদের সার্জারি পড়ানো হয় না, সেখানে সার্জেনদের ঢুকতে দেওয়া হয় না, এইসব শুনে তো রাজামশাই হতভম্ব। তিনি এবার গেলেন একদিন সেন্ট কেমি পরিদর্শনে।

ফিজিশিয়ানরা রাজাকে দেখে ঘাড়-মাথা চুলকোতে লাগলেন, রাজাকে নানা উলটোপালটা কথা বোঝাতে লাগলেন। কিন্তু রাজাকে মিথ্যে বোঝানো কি এতই সহজ! রাজা হুঙ্কার দিয়ে উঠে বললেন, "আমি তোমাদের কোনও কথাই শুনতে চাই না। আমার আদেশ, এক্ষুনি তোমাদের সার্জেনদের এখানে বহাল করতে হবে শিক্ষক পদে। শুরু করতে হবে ছাত্রদের সার্জারি পড়ানো।"

সেন্ট কেমির ছাত্রদের আনন্দ যেন তখন আর ধরে না। সেই কবে থেকে তারা রয়েছে সার্জারি শেখার অপেক্ষায়। সেন্ট কেমির রোগীরাও এবার সব যেন ধড়ে প্রাণ পেল। সময়ে সার্জারি না করার জন্য কত রোগী যে তখন সেখানে মারা যেত! তারাও পুনর্জীবন পেতে শুরু করল।

দেখতে-দেখতে সেন্ট কেমিতে সার্জেনরাই হয়ে উঠলেন ছাত্রদের চোখের মণি। আর তাই দেখে তো ফিজিশিয়ানরা সব রাগে জ্বলে উঠলেন। দিনরাত তাঁরা মনে-মনে মতলব ভাঁজতে লাগলেন, কী করে ওই সার্জেনগুলোকে জব্দ করা যায়। ভাবতে-ভাবতে শেষে তাঁরা গিয়ে একদিন হাজির হলেন প্যারিসে 'ফ্যাকাল্টি অব ফিজিশিয়ানস'-এর দরবারে।

ফ্যাকাল্টি তো তখন মনে-মনে ওইটাই চাইছিল। ফিজিশিয়ানরা একদিন আসুন। রাজার অবিচারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে যান। ফ্যাকাল্টি টপকে রাজামশাই কিনা মেডিকেল কলেজে শিক্ষক নিয়োগ করবেন সরাসরি। কিন্তু না, রাজামশাই ফ্যাকাল্টির

কোনও অভিযোগ মোটেই কানে তুললেন না। বললেন, "সেন্ট কেমিতে যা করেছি আমি, ঠিকই করেছি। দেশটা যখন আমার, তখন আমার ইচ্ছেই বলবৎ থাকবে।"

বটে! প্যারিসের ফ্যাকাল্টির সদস্যরা রাজার ব্যবহারে এবার ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। রাজাকে হুমকি দিয়ে বললেন, "আমাদের কথা না শুনলে সেন্ট কেমির দরজা কিন্তু আমরা বন্ধ করে দেব। দেশের চিকিৎসাব্যবস্থাকে দেব শিকেয় তুলে। আমরা হরতাল ডাকব।"

"ডাকো হরতাল। দাও বন্ধ করে সেন্ট কেমির দরজা। দেখি তোমাদের ক্ষমতা।" রাজাও তাদের পালটা চোখ রাঙিয়ে দিলেন।

পরিণামে দেশের ফিজিশিয়ানরা এবার বিদ্রোহী হয়ে সত্যিই ডেকে বসলেন এক হরতাল!

সে এক কাণ্ড! শীতের সকাল। সবে একটু আলো ফুটেছে। দেশের অধিকাংশ মানুষই তখনও লেপের তলায়। এমন সময় হঠাৎ শুনতে পেল তারা, পথ থেকে ভেসে আসছে বহু মানুষের পদধ্বনি! মানুষের গুঞ্জন!

ও কিসের শব্দ? পথের দু'ধারের মানুষ বিছানা ছেড়ে দৌড়ে গিয়ে দাঁড়াল জানলায়, বারান্দায়। বিচিত্র বেশভূষায় এ কারা চলেছেন মিছিল করে!

দেখতে-দেখতে রাস্তার দু'ধারে জমে উঠল ভিড়। অবাক বিস্ময়ে দেখল সবাই, যারা মিছিল করে যাচ্ছেন তাঁরা সব দেশের গণ্যমান্য ফিজিশিয়ান! পায়ে হেঁটে তাঁরা চলেছেন সেন্ট কেমি মেডিকেল কলেজের দিকে। কী আশ্চর্য! যাঁদের দেখা পাওয়ার কথা সাধারণ মানুষ কখনও চিন্তা করতে পারে না, তাঁরা কিনা নেমেছেন পথে!

শোনা গেল, আজ নাকি ফিজিশিয়ানরা সেন্ট কেমিতে পৌঁছে তার গেট বন্ধ করে দেবেন। সেখানে তাঁরা অবস্থান ধর্মঘট করবেন। পথসভা করবেন। কিন্তু সেখানে পৌঁছে তাঁরা দেখেন, হাসপাতালের গেট আগেভাগেই কারা যেন বন্ধ করে রেখেছে। কিন্তু কে, কারা বন্ধ করল ওই গেট?

এবার শুরু হল দরজা ঠেলাঠেলি। চিৎকার, চেঁচামিচি।

আর সেইসঙ্গেই শুরু হল ইট-বৃষ্টি! গেটের ওপার থেকে আধলা ইট এসে পড়তে লাগল ফিজিশিয়ানদের গায়ে, মাথায়।

প্রাথমিক ধাক্কাটা সামলে উঠেই ফিজিশিয়ানরাও শুরু করলেন পালটা আক্রমণ। তাঁরাও সমানে ইট-পাথর ছুঁড়তে লাগলেন।

কিন্তু এ কী! ফিজিশিয়ানদের ইট ছুঁড়তে দেখে এবার পথের মানুষও হঠাৎ খেপে উঠল। তারাও শুরু করে দিল ফিজিশিয়ানদের ওপর আক্রমণ। ফিজিশিয়ানদের লক্ষ করে চারদিক থেকে ইট পড়তে শুরু করল। ফিজিশিয়ানরা হতচকিত হয়ে ছুট লাগালেন। না পালিয়ে আর উপায় কী? কিন্তু ততক্ষণে তাঁদের কারও মাথা ভেঙেছে, পা ভেঙেছে, কেউ কাতরাচ্ছেন, কাঁদছেন। ফিজিশিয়ানরা সব পালাতেই দুদ্দাড় করে খুলে গেল সেন্ট কেমির দরজা। আর হইহই করে বেরিয়ে এল সাজারিপাগল ছাত্রের দল। আনন্দে তাদের বুকে টেনে নিল দেশের যত দীন, দুঃখী, সাধারণ মানুষ।

ছবি দেবাশিস-দেব

কবিতা

রহস্য-সন্ধানী

অনিমেষ বসু

তোপসের বাড়ি গেছ কোনোদিন,
গোগোলকে তুমি চেনো?
সন্তুকে তুমি এই পথে যেতে
দেখেছ কি কক্ষনো?
যদি পাজি লোক তোমাকে শাসায়
যদি যায় কিছু চুরি,
সন্তু, তোপসে, গোগোলকে ডেকো
ভেঙে দেবে জারিজুরি।
জাল পেতে রাখে সন্তু তোপসে
রহস্য-সন্ধানী,
ওই জালে ঠিক ধরা পড়ে যায়
যত ঠক-সাবধানী।

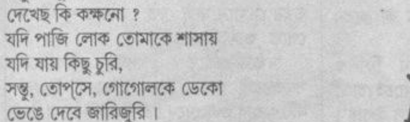

ছবি : কৃষ্ণেন্দু চাকী

হয়তো গোগোলও ওত পেতে আছে
অসীম কৌতূহলে,
চকিতে হয়তো সামনে দাঁড়াবে
নেহাতই খেলার ছলে।
আরো যদি থাকে জানার ইচ্ছে
বাড়ি এসো তবে হাবু,
সেখানে আছেন অশোক ঠাকুর
ফেলুদা ও কাকাবাবু।
ছিলেন মানিক আর জয়ন্ত
কয়েক দশক আগে,
ব্যোমকেশ আর বন্ধু অজিত
ভাবতেও ভাল লাগে।

Amela—4 (14.11.90)

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

বিশ্ববিচিত্রা

জন লেননের পঞ্চাশ বছর

বেঁচে থাকলে জন লেননের
আজ বয়স হত পঞ্চাশ বছর ।
বিটলস-এর কিংবদন্তি লেনন ।
লিখেছেন **বিকাশ চক্রবর্তী**

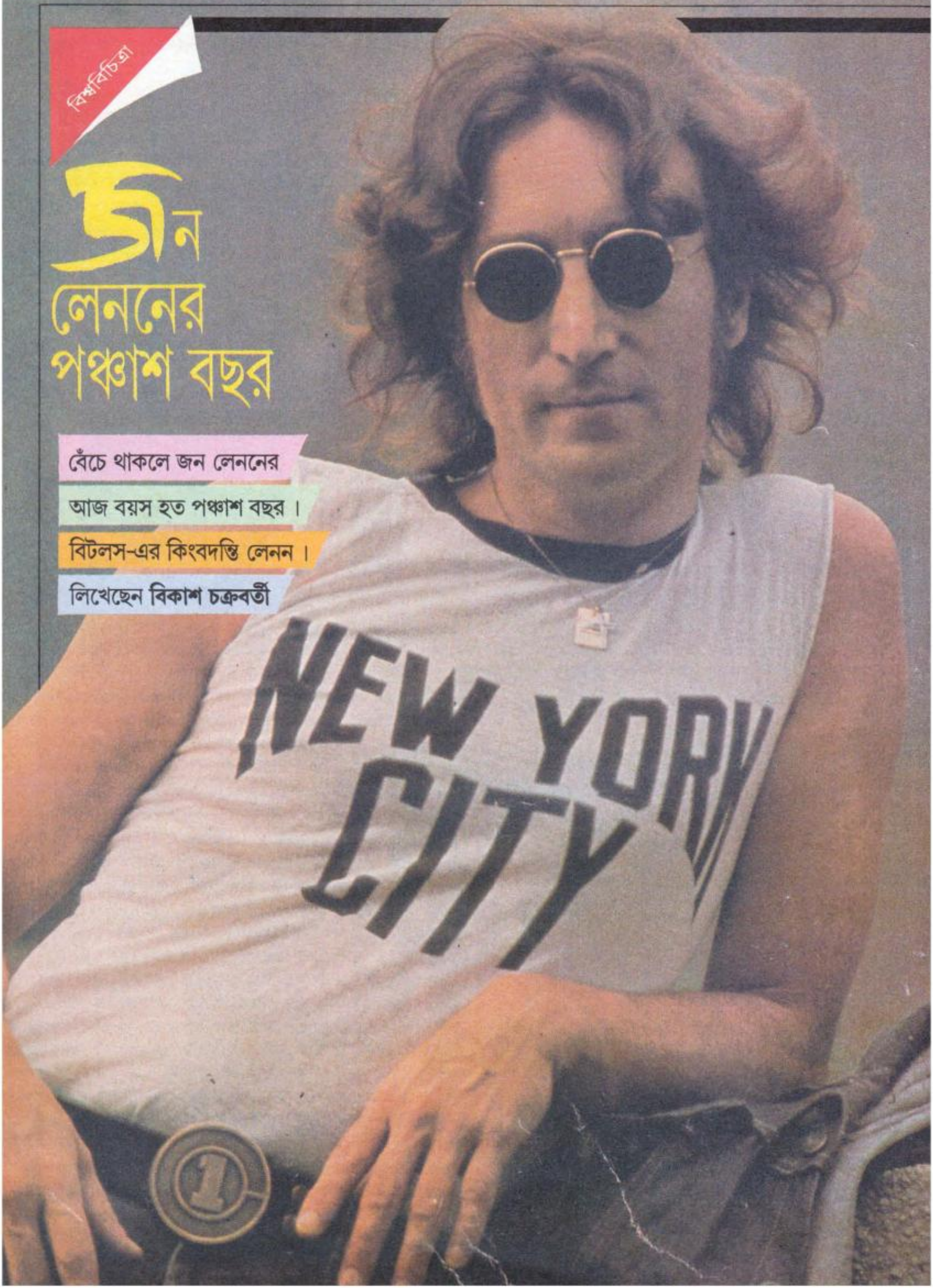

পয়েন্ট থার্টি এইট স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন রিভলভারটা পকেটে নিয়ে ড্রাইভওয়ের অন্ধকারে অপেক্ষা করছিল মার্ক চ্যাপম্যান। রাত এখন প্রায় এগারোটা। ডিসেম্বরের নিউ ইয়র্কের হাড়কাঁপানো শীত। অদূরে সেন্ট্রাল পার্কের দিক থেকে হু-হু করে হিমেল হাওয়া ভেসে আসছে।

ওয়েস্ট বাহাত্তর নম্বর রাস্তার পাশে রাজপ্রাসাদের মতো বিশাল এই বিলাসবহুল বহুতল বাড়ির নাম 'ডাকোটা'। মানহাটানের ক্রোড়পতিদের বাসভূমি।

ড্রাইভওয়ের বুক চিরে দুটো উজ্জ্বল আলো ক্রমশ এগিয়ে আসছে। মার্ক চ্যাপম্যান অস্থির হয়ে উঠল। এই লিমুজিনটা সে বেশ ভালভাবেই চেনে।

ডাকোটায় ঢোকার মুখে একটা পাথরের আর্চওয়ে, লিমুজিনটা তার কয়েক হাত আগেই থেমে গেল। তারপরই গাড়ির দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন তিনি!

ফুটন্ত লাভার মতো উত্তেজনায় ছটফট করছে চ্যাপম্যান। এই তো উনি এগোচ্ছেন। সারা পৃথিবী যাঁকে একবার দেখার জন্য, একবার যাঁর গান শোনার জন্য উন্মাদের মতো অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে, সেই তিনি আজ চ্যাপম্যানের এত কাছে! মাত্র এক হাতের ব্যবধানে রক্তমাংসের সেই জীবন্ত কিংবদন্তি! "জন লেনন!" চ্যাপম্যান ফিসফিস করে ডাকল।

পরমুহূর্তেই নিস্তব্ধ সেই ড্রাইভওয়ে কাঁপিয়ে শোনা গেল গুলির শব্দ। পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জে গুলি চালাচ্ছে চ্যাপম্যান। একবার নয়, বারবার।

অভিশপ্ত ৮ ডিসেম্বরের রাত। ১৯৮০ সালের ৮ ডিসেম্বর। রাত শেষ হতে-না-হতেই দাবানলের মতো দুঃসংবাদ ছড়িয়ে পড়ল সর্বত্র, পৃথিবীর এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত। আততায়ীর গুলিতে জন লেনন নিহত।

বেঁচে থাকলে আজ তাঁর বয়স হত মাত্র পঞ্চাশ! পৃথিবীকে আজও মাতিয়ে যেতেন সুরের ঝরনাধারায়। কারণ জন লেনন মানেই একটা যুগ। বিটলস-এর যুগ। লেনন, ম্যাককার্টনি, জর্জ হ্যারিসন আর রিঙ্গো স্টার-এর সেই বিটল্‌স! গানের সুরে ভেসে যাওয়ার সেইসব দিন···

—উই আর অন দ্য ইয়োলো সাবমেরিন!
ইয়োলো সাবমেরিন!

—হেল্প মি ইফ ইউ ক্যান
আই অ্যাম ফিলিং ডাউন।
হেল্প মি গেট মাই ফিট
ব্যাক অন দিস গ্রাউন্ড!

১৯৪০ সালের ইংল্যান্ড। ইউরোপের আকাশে এখন নাৎসি ফাইটার আর বম্বার বিমানের একচ্ছত্র আধিপত্য। প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিলের সুদক্ষ পরিকল্পনায় ব্রিটেন তখনও ঠেকিয়ে রেখেছে জার্মান ঝটিকা-বাহিনীকে।

৯ অক্টোবর, ১৯৪০। লিভারপুলের আকাশে তখন ঝাঁক-ঝাঁক বোমারু বিমান। সেই বম্বিং রেইড-এর মধ্যেই আচমকা শোনা গেল নবজাতকের কান্না। নিউক্যাসল রোডের নোংরা অপরিচ্ছন্ন এক অ্যাপার্টমেন্টে জন্মেছে জুলিয়া লেননের প্রথম সন্তান। নাম তার জন উইনস্টন লেনন।

অবধারিতভাবে লেননের এই মাঝের নামটি জুলিয়ার দেশপ্রেমের সাক্ষ্য। ব্রিটেনের জাতীয় নেতা উইনস্টন চার্চিলের প্রথম নামটিই জুলিয়া তাঁর পুত্রের জন্য বেছে নিয়েছেন।

জুলিয়া তখনও জানতেন না, এই বম্বিং রেইডের মধ্যে জন্মেছে যে-শিশু, একদিন সে গান গেয়ে সারা পৃথিবীকে উদ্দীপ্ত করে তুলবে যুদ্ধের বিরুদ্ধে। গিটারের ঝঙ্কারে গেয়ে উঠবে 'গিভ পিস আ চান্স', 'ইমাজিন' বা 'পাওয়ার টু দ্য পিপল'-এর মতো গান।

লিভারপুল ব্রিটেনের একটি বন্দর-শহর, ছোট-ছোট সি-লাইনার ও ক্রুজার জাহাজ এখান দিয়ে যাতায়াত করে। জনের বাবা ফ্রেড লেনন এরকমই এক জাহাজের নাবিক। পুত্রের জন্মের আগেই তাঁকে জাহাজে করে কোথায় যেন চলে যেতে হয়েছে, তাঁর আর কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

কুড়ি বছর পর ছেলের মুখ দেখতে ফিরে এসেছিলেন দরিদ্র সেই নাবিক। তাঁর জাহাজ নাকি বিপর্যয়ে পড়েছিল, শত্রু-দেশের হাতে পড়ে এতদিন তিনি কারাগারে কাটিয়েছেন।

স্বামী নিরুদ্দেশ, একমাত্র সন্তানকে পালন করতেও জুলিয়ার বিন্দুমাত্র উৎসাহ নেই। জুলিয়ার বোন মিমি ও তাঁর স্বামী জর্জের কোনও সন্তানাদি নেই। মিমি বেশ আদরেই এই সদ্যোজাত শিশুটিকে তাঁর কাছে এনে রাখলেন।

বন্দর-নগরী লিভারপুলের উলটন শহরতলিতে মেনলোভ অ্যাভেনিউয়ে মিমিদের বাড়ি। মিমির সস্নেহ যত্নে দুরন্ত এই শিশুটি আস্তে-আস্তে বড় হয়ে উঠতে থাকে, তাকে ভর্তি করে দেওয়া হল ডোভডেল প্রাইমারি স্কুলে।

ছোট্ট বয়স থেকেই জন ভীষণ দুরন্ত,

সমবয়সী ছেলেদের সঙ্গে সর্বদাই তার মারপিট লেগে থাকে।
বারো বছর বয়সে ডোভডেল প্রাইমারি স্কুল ছেড়ে জন ভর্তি হল কোয়ারি ব্যাঙ্ক স্কুলে। তখনও তার স্বভাব বিশেষ বদলায়নি। কিন্তু মিমিকে ছাড়া আর একজনকেও সে খুব ভালবাসে। সেই ভদ্রমহিলা লিভারপুলেই অন্য এক জায়গায় বাস করেন, জনকে দেখতে প্রায়ই তিনি মিমিদের বাড়িতে আসেন।
ভদ্রমহিলা আর কেউ নন, জুলিয়া লেনন। জনের মা।
জুলিয়া স্বভাবে একেবারেই তাঁর বোন মিমির উলটো পিঠ। মিমি স্নেহশীলা, কিন্তু কঠোর নিয়মানুবর্তী। জুলিয়া হাসিখুশি, আমোদে উচ্ছল। জনের প্রথম রঙিন জামাটা তিনিই কিনে দিয়েছিলেন। সেইসঙ্গে জন জুলিয়ার কাছে আরও একটা আবদার করেছিল। জুলিয়া ছেলের সেই আবদার রেখেছিলেন।

আট বছর বয়সে, মায়ের সঙ্গে

জন লেননের জীবনের প্রথম গিটারটা কিনে দিয়েছিলেন তাঁর মা জুলিয়া।

লিভারপুলের ছেলেরা অদ্ভুত উচ্চারণে ইংরেজি বলে, রাজধানী লন্ডনের লোকেরা ঠাট্টা করে এই ইংরেজিকে বলেন 'স্কাউজ'। আমেরিকান নাবিকদের দেখাদেখি লিভারপুলের কিশোর ছেলেরাও তখন জিনস পরা শুরু করেছে, ক্লাবে গিটার বাজিয়ে গান গাইছে।
জিনস পরাটাকে মিমি বেশ গর্হিত কাজ বলেই মনে করতেন। জুলিয়া জনকে একটা জিনস কিনে দিয়েছিলেন, জন সেই জিনসের ওপর জুলিয়ার দেওয়া স্যুট পরত, তারপর কাছাকাছি বাস-স্টপে এসেই স্যুটটা খুলে নিত।

ষাটের দশকে ফ্যাশনের জগতেও লেনন এনেছিলেন এক নতুন জোয়ার। ড্রেন পাইপ প্যান্ট, জ্যাকেট আর ইলাস্টিক বুটজুতো। স্যুটপরা অভিজাত্যের যুগ তখন শেষ।

স্যুটপরা এই আভিজাত্য একেবারেই জনের ধাতে সয় না। সে ভালবাসে গান গাইতে। কোনও শিক্ষকের কাছে শেখেনি, কিন্তু মাউথ অর্গান বাজাতে পারে অসাধারণ। প্রতি বছর গ্রীষ্মের ছুটিতে সে এডিনবরাতে তার মাসির বাড়ি যায়, তখন লিভারপুল থেকে এডিনবরা গোটা রাস্তা সে বাসের জানলার ধারে বসে মাউথ অর্গান বাজায়।
সতেরো বছর বয়সে লিভারপুল আর্ট কলেজে ভর্তি হল জন। তখন সে এলভিস প্রিসলের গানের ভক্ত। বন্ধুদের নিয়ে একটা গানের দল খুলেছে, ম্যাথু স্ট্রিটের ক্যাভার্ন ক্লাবে তখন জন আর তার বন্ধুরা গান গায়।
সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতার মতো আঠারো বছর বয়সটা জনের কাছে রীতিমত দুঃসহ। পথচলতি জুলিয়াকে আচমকা পেছন থেকে ধাক্কা মারল এক গাড়ি।
মাতৃহারা জন। এখন গানই তার একমাত্র আশ্রয়। সেইসঙ্গে আছে দুই বন্ধু। তারাও

মৃত্যুর কয়েক ঘন্টা আগে আততায়ী চ্যাপম্যানের রেকর্ডে সই

লিভারপুলের ছেলে। জন পড়ত কোয়ারি ব্যাঙ্ক স্কুলে, এই ছেলে দুটি পড়ত লিভারপুল ইনস্টিটিউটে।
জনের এই দুই বন্ধুর নাম ? পল ম্যাককার্টনি আর জর্জ হ্যারিসন। জর্জ গিটার বাজায়, পল আর জন দু'জনে মিলে গান লেখে। ড্রাম বাজায় জনি হাচ বলে আর-একটি ছেলে। কয়েক মাসের মধ্যেই এই চারজন কিশোর তৈরি করল একটা গানের দল, নাম তার 'কোয়ারিম্যান'। লেনন, ম্যাককার্টনি আর

জর্জ হ্যারিসনের তৈরি সেটাই প্রথম গ্রুপ। দু' বছর পর এই কোয়ারিম্যান দল গান গাইতে গেল জার্মানির হ্যামবুর্গে। ততদিনে ড্রামার হিসেবে হাচ আর নেই, দলে এসেছে রিঙ্গো স্টার নামে এক তরুণ। কোয়ারিম্যান নামটাও পালটে গেছে।

১৯৬০ সালেই কোয়ারিম্যান নাম বদলে দলের নাম রাখা হয়েছে বিটল্‌স!

হ্যামবুর্গের সাফল্যের পর এই দলটা আর কোনওদিন পেছনে ফিরে তাকায়নি। ক্যাভার্ন ক্লাব থেকে শুরু করে বি বি সি রেডিও, পার্লোফোন রেকর্ড, টেলিভিশন সর্বত্র শুধু বিটল্‌স আর বিটল্‌স। স্কাউজ উচ্চারণে গান গাওয়া, লিভারপুলের সেই চারজন অদম্য তরুণ। 'টপ টেন চার্ট' মানেই বিটল্‌স। ১৯৬৪ সালেই তারা জয় করে ফেলল অতলান্তিকের অন্যপারের মহাদেশটা। আমেরিকায় সবচেয়ে বেশি বিক্রির রেকর্ড সেবার 'আই ওয়ান্ট টু হোল্ড

...ছেন লেনন

ইওর হ্যান্ড'। লেনন-ম্যাককার্টনির অমর সুরসৃষ্টি। হিথরো বা ফ্রাঙ্কফুর্ট সর্বত্র এয়ারপোর্টে এই তরুণদের জন্য দাঁড়িয়ে থাকে কাতারে-কাতারে উদ্‌গ্রীব দর্শক।

বিটল্‌স মানেই লেনন, লেনন মানেই একটা যুগ। সঙ্গীতের সব বেড়া আজ ভেঙে দিয়েছে পঁচিশ বছরের এক যুবক।

১৯৬৫ সালের ১২ জুন। তখনও লেননের বয়স পুরোপুরি পঁচিশ হয়নি। মহারানির তরফ থেকে বিটল্‌সদের দেওয়া হল এম বি ই মেডেল।

বি বি সি, রেডিও পার্লোফোন রেকর্ড, টেলিভিশন সর্বত্র শুধু বিটল্‌স আর বিটল্‌স। স্কাউজ উচ্চারণে গান গাওয়া, লিভারপুলের সেই চারজন অদম্য তরুণ। সর্বত্র তাদের জন্য দাঁড়িয়ে থাকে কাতারে কাতারে উদগ্রীব দর্শক।

তারুণ্যে ভরা বিটল্‌স দল। লেনন, জর্জ হ্যারিসন, পল ম্যাককার্টনি ও রিঙ্গো স্টার

চার বছর বাদে লেনন তাঁর মেডেল মহারানিকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। ভিয়েতনাম যুদ্ধে আমেরিকাকে ব্রিটেনের সমর্থনের প্রতিবাদে।

যেখানেই যুদ্ধ, দাঙ্গা, বর্ণবিদ্বেষ, সেখানেই প্রতিবাদ করেছেন জন। প্রতিবাদী তারুণ্যের তখন তিনি মুখপাত্র। ছাড়েননি তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। নিউ ইয়র্কের প্রাসাদোপম বাড়ি ছেড়ে কখনও-কখনও বাস করেছেন বিট কবিদের আস্তানা গ্রিনউইচ ভিলেজে। জ্যাক কেরুয়াক, অ্যালেন গিনসবার্গ বা গ্রেগরি করসোর মতো তিনিও তখন কবিতা লিখছেন, তাতে সুর বসাচ্ছেন। স্বপ্ন দেখছেন নতুন এক পৃথিবী, 'ইমাজিন দেয়ার ইজ নো হেভেন ...'

মার্ক চ্যাপম্যানকে যখন মার্কিন পুলিশ গ্রেফতার করেছিল, তখনও তার হাতে ধরা ছিল লেননের নতুন এল পি রেকর্ড। সেদিন বিকেলেই চ্যাপম্যান লেননের অটোগ্রাফ চেয়েছিল, লেনন তাতে সইও দিয়েছিলেন। স্তম্ভিত সমস্ত পৃথিবী। মিক জ্যাগার মাঝপথেই থামিয়ে দিলেন তাঁর যাবতীয় সব প্রোগ্রাম। 'ডেইলি মিরর' বড় করে হেডিং ছাপল, 'ডেথ অব আ হিরো', অর্থাৎ নায়কের মৃত্যু'! 'টাইম' পত্রিকা লেননকে বর্ণনা করল কবি বলে। নিউ ইয়র্কের সেন্ট্রাল পার্কে বেরোল ১০,০০০ লোকের এক মৌন-মিছিল। লন্ডনের হাইড পার্ক, ট্রাফালগার স্কোয়ার সর্বত্র বাজছে 'গিভ পিস আ চান্স'। বরফঝরা সেই শীতের রাতে টরোন্টো শহরে লেননের স্মৃতির উদ্দেশে মোমবাতি জ্বালাল ৩৫,০০০ যুবক-যুবতী। পশ্চিম জার্মানিতে জনের রেকর্ড বিক্রি হত সপ্তাহে দশ হাজার, সেদিন হল দিনে পঞ্চাশ হাজার। পূর্ব জার্মানিতে পপ সঙ্গীত নিষিদ্ধ, তা সত্ত্বেও সরকারি রেডিও দেড় ঘণ্টা ধরে বাজাল বিটল্‌সের গান।

আততায়ীর গুলিতেও শেষ হননি জন লেনন। মৃত্যুর পরেও অন্তত কয়েক ঘণ্টার জন্য তিনি ভুলিয়ে দিয়েছিলেন যাবতীয় রাজনৈতিক বিভেদ, এক করে দিয়েছিলেন দুই জার্মানিকে।

জন লেনন জানতেন না, তাঁর মৃত্যুর দশ বছর পর সত্যিই এক হয়ে যাবে দুই জার্মানি। জন লেনন জানতেন না, ১৯৯০ সালেই দুই জার্মানি একসঙ্গে মিলবে। সেই মিলনের বছরেই উদ্‌যাপিত হবে তাঁর পঞ্চাশতম জন্মদিন।

গল্প

দুই বোন

শিবতোষ ঘোষ

ন' হাত দীর্ঘ, সাড়ে চার হাত প্রস্থ ছিটেবেড়ার ঘর, মাঝখানে বেড়া। একদিকে থাকে সুখদা, একদিকে কুলদা। সামনে বালিমাটির নিকনো সাদা উঠোন। আধখানা সুখদা ন্যাতা দেয়, আধখানা কুলদা ন্যাতা দেয়। উঠোন পেরোলেই ডালপালা জুড়ে বিশাল এক চালতা গাছ। চালতাতলায় গ্রাম-দেবী। একটা সিঁদুর-লেপা পাথর, কয়েকটি সিঁদুরমাখা ঘোড়া। কয়েকটা ঘোড়া উলটে পড়ে আছে, দু-তিনটের ঠ্যাং ভাঙা।

প্রথমে ছিল খুব বড় দরদালান দেওয়া কোঠা, সেটাই ক্রমশ ছোট হতে-হতে এই পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। এত খড়-বাঁশ জোগাবে কে? থাকার লোকজনও আস্তে-আস্তে কমে এল, সবশেষে কে গেল যেন···মনে করতে চেষ্টা করেও সঠিক মনে করতে পারে না, বয়স হয়েছে, কত? চার কুড়ি দুই। কুলদার তা হলে চার কুড়ি! হবে।

সুখদা-কুলদা পিঠোপিঠি বোন, দু' বছরের ছোট-বড়। বোন কি না তাদেরই মাঝেমধ্যে সন্দেহ হয়, তিরিশ বছর হয়ে গেল কথাবার্তা নেই। যে যার ঘরে রান্না করে, খায়দায়, শুয়ে থাকে। মাঠে তিন বিঘে করে ধানিজমি আছে, ভাগচাষিরা চাষাবাদ করে ধান ঝেড়ে দিয়ে যায়, ওতেই চলে যায়। আগে দু-একটা গোরু-ছাগল ছিল, এখন তাদেরই সকালবেলা দেওয়াল ধরে উঠতে হয়, গোরু-ছাগল বের করবে কে। চালতা গাছের চালতারও সমান ভাগ। বুধু মাঝি প্রতি বছর গড় হয়ে প্রণাম করে চালতা গাছে উঠে চালতা পাড়ে। সুখদা-কুলদা বসে-বসে গোনা-গুনতি ভাগ নেয়। দু'জনেরই সাদা ধবধবে মাথার চুল, চামড়া ঝুলে গেছে, দাঁত বলতে কিছু নেই, কানে কম শোনে, চোখেও ঝাপসা দেখে। সুখদার বারোমাস কাশি, সকাল-সন্ধে ঝোঁককে ঝোঁক। কুলদার বাত, সেও সকাল-সন্ধে যন্ত্রণায় কাতরায়, নড়তে পারে না।

সুখদা-কুলদার কেন এত বিবাদ কেউ জানে না। কুলদাকে জিজ্ঞেস করলে, "হ্যাঁ গো ছোটপিসি, বড়পিসির সঙ্গে তোমাদের কথা হয়নি কেন গো? সংসারে দু'টা বোন একসঙ্গে কী সুন্দর হাসি-খুশিতে দুটিতে থাকবে।"

কুলদা বলে, "ও ব্যারামির কথা আমার কাছে বলিসনে তো তোরা, গায়ে সহ্য হয় না।"

সুখদাকে বললে সে বলে, "ও হল হিংসেমড়ি, ব্রহ্মবাত কি সাধে হয়েছে!"

তাদের বিষয়সম্পত্তি নিয়ে কোনও গণ্ডগোল নেই, ওদের বুড়ো বাবা মারা যাওয়ার আগে স্থাবর-অস্থাবর সব সমান দু' ভাগে বাটোয়ারা করে দলিল করে দিয়ে গেছে। কারও ছেলেপুলেও নেই যে তাদের জন্য কোনওরকম অশান্তির সৃষ্টি হবে। দু'জনেই বিধবা হয়ে বাপের ভিটেয় আশ্রয় নিয়েছে। দুজনেরই জোয়ান ছেলেমেয়ে কী হল টপাটপ করে করে মরে গেল। মা মারা গেল, তারপর বাবা মারা গেল।

তাদের দু'জনের স্বামীই মারা গিয়েছিল একসঙ্গে, নৌকোডুবি হয়ে। দু'জনেরই বেশ তাগড়াই চেহারা। সাঁতার জানতও

ভাল। হঠাৎ কীরকম বেকায়দায় পড়ে যায়। দু' জামাই শ্বশুরবাড়ি থেকে জামাইষষ্ঠীর আম-কাঁঠাল খেয়ে নতুন কাপড় পরে ফিরছিল। শ্বশুরের ভালই অবস্থা, তিন হালের চাষ। মারা যাওয়ার সময় দেখা গেল দু'জনে গলা জড়াজড়ি হয়ে আছে। নৌকোর খোলের ভেতরে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। যারা ধারেপাশে ছিল তারা হুশহাশ এদিক-সেদিক যাই হোক বেরিয়ে এল কিন্তু জামাইরা আর বেরোতে পারেনি। মানুষ মরবার সময় হাতের কাছে যা পায় তাকেই ধরে। অনেকে বলল—ওদের কারওর কিছুই হত না, যদি-না এই জড়াজড়িটা হত! হয়তো একজন ভয় পেয়ে প্রথম জড়িয়েছে, ব্যস।

কিন্তু সেই একজন?

সুখদা ভাবল, "কুলদার স্বামী।"

কুলদা ভাবল, "সুখদার স্বামী।"

সুখদা-কুলদার বিরোধটাও সেইদিন থেকে। স্বামী বিষয়টা দু'জনেরই কাছে এখন ঝাপসা হয়ে গেছে। কিন্তু বিরোধটা মেটেনি।

॥ ২ ॥

দু' ঘরের মাঝখানের ভাগটা বেড়াকঞ্চির। কাদা লেপা হয়নি, খরচের গণ্ডগোল নিয়ে থেকে গেছে।

সুখদা বলে, "কুলদা দেবে।"

কুলদা বলে, "সুখদা দেবে।"

ফলে, অনেকদিকে সুবিধেও হয়েছে। সবচেয়ে সুবিধে হয়েছে মঙ্গলার।

মঙ্গলা হল একটা লেজকাটা বেড়াল।

সে দিব্যি বেড়া গলে ফুকফাক যাতায়াত করতে পারে।

সুখদা ডাকে, "মঙ্গলা! এদিকে চলে আয়!"

কুলদা ডাকে, "মঙ্গলা! আসবি তো আয়, না হলে এই শেষ কিন্তু!"

মঙ্গলা দু'জনের পাতে খায়। দু'জনের কাছে শোয়। দু'জনেরই গায়ে গা ঘষে। লেজ বুলোয়।

সুখদা-কুলদার মধ্যে যাবতীয় কথা হয় এই বেড়ালকে ঠেস দিয়ে-দিয়ে।

"থাম-থাম, কে তোকে ভাত দেয় দেখব।"

"মঙ্গলা, বলে দে, আমি আছি বলে, না হলে কবে তোকে ইঁদুরের গর্তে টেনে নিয়ে যেত। গর্তগুলোও বন্ধ করার গতর নাই, মরবে থাম!"

তার পরদিন ন্যাতা দেওয়ার সময় সত্যি-সত্যি গর্ত বন্ধ করতে বসে যায় কুলদা। ঠিকই বলেছে, ইঁদুরের গর্ত দিয়ে অনেক সময় সাপ আসে।

কিন্তু আজ ক'দিন হল সুখদা-কুলদা খুব কাছাকাছি শুচ্ছে। মাঝখানে শুধু বেড়াটা মঙ্গলার যাতায়াতের সুবিধের জন্য নীচের বেড়ায় আরও বেশি করে কয়েকটা ফাঁক করে দিয়েছে। তারা দু'জনেই একটা সমস্ত দিন বসে-বসে এই-ই করল। আর ইন্দ্রবাগাল ছিটেবেড়া বেঁধেছিল, তাকে গাল পাড়ল।

এখন কুলদার বিড়াল শুধু মাথা গলালেই সুখদার বিড়াল হয়ে যায়।

দু'জন দু'জনকে ছুঁতে পারে।

না, ছোঁয় না কেউ।

আজ তিরিশ বছর তারা কেউ কাউকে স্পর্শ করেনি।

আগে শুত ঘরের এ-মাথায় একজন। একেবারে ও-মাথায় আর-একজন।

একদিন বাতের যন্ত্রণায় প্রচণ্ড চিৎকার করে গড়াগড়ি খাচ্ছিল কুলদা। সেদিন সুখদার গালাগালি! মঙ্গলাকে বলছে, "কী হল যা! দুদু ভাতি খাবি, তোর জন্য যে কুলার বাতাস দিচ্ছে।"

"শুয়েছেন দ্যাখো, তিন ক্রোশ দূরে, একটু গরম তেল যে বাড়িয়ে দেব তারও তো...."

এর পর থেকে বেড়ার দু' দিকে দু'জনে বিছানা পাতে। সুখদা বেশি কাশলে একগ্লাস গরম জল, কুলদার বাতের যন্ত্রণা উঠলে গরম তেল, তারা গলিয়ে দেয় মঙ্গলার যাওয়ার পথ দিয়ে।

ইঁদুর-গর্তে মাটি লেপছিল, হাত ধুয়ে কুলদা একটা চাদর গলিয়ে দিল। মঙ্গলাকে বলল, "চাদরটা গায়ে নিতে বল, জাঁকানো শীত ছাড়া তো চাদর বের করবেনি। জিজ্ঞেস কর, মরে গেলে কে গায়ে দেবে!"

আজ সকাল থেকে খুব কাশছে সুখদা।

কুলদা জল গরম করে দিয়েছে, খেয়েছে।

ওই, খেলেই একটু কমে, তারপর যেই-কে-সেই। বুক হাঁইপাঁই করছে, ভেতরে প্রচণ্ড শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। অ্যাঁ...করে অনেকক্ষণ ভেতরে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে থেকে যায়। আটকে যাওয়ার মতো।

কাঁচা বিউলি বেটে গরম তেল করল কুলদা।

"বিউলির তেল গরম করে নিয়ে যাচ্ছি, মঙ্গলা, উঠে বসতে বল! এরকম বুকের টান শুনলে জীবন উড়ে যায়, বাবা!"

কার যেন এরকম শ্বাসকষ্ট দেখেছিল!

অনেক ধরনের মৃত্যু দেখেছে সুখদা-কুলদা।

তাই বোধ হয় সুখদা-কুলদা একটু অন্য ধরনের মরতে চায়!

শয়তান সাপ আর বন্ধুত্বভরা পট্টি

এখানে শুরু
এই মজার খেলা খেলতে তোমার চাই·
একটা চালার ঘুঁটি আর এক বন্ধুকে।

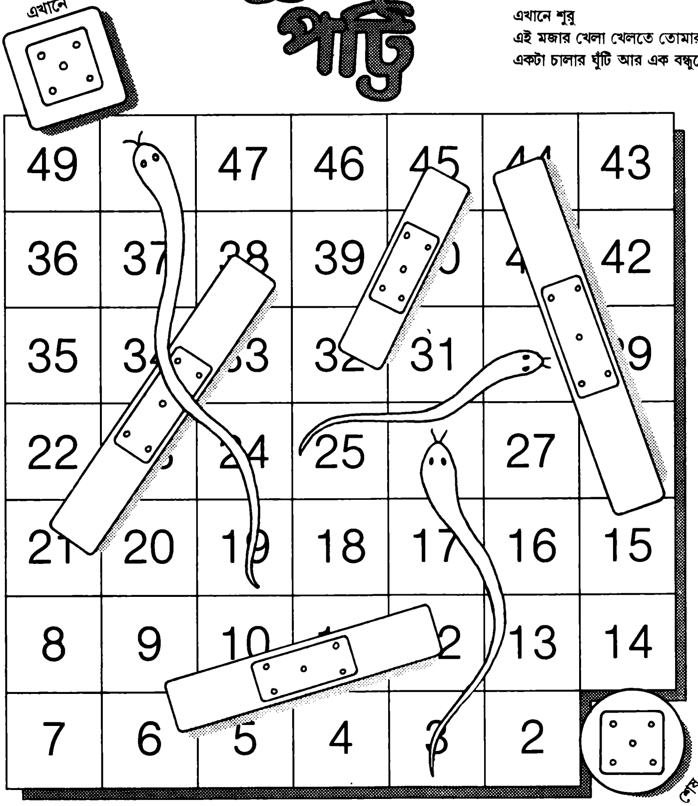

যদি চলতে চলতে তুমি শয়তান সাপের· মুখের
খপ্পরে পড়ো, ব্যস, সড়সড় করে নেমে
আসবে সাপের ল্যাজের শেষে।
তবে, যদি খেলতে খেলতে বন্ধুত্বভরা পট্টির
তলায় পৌঁছতে পারো তো, কেল্লা মার
দিয়া, টপাটপ উঠে যাবে পট্টির মাথায়।

ডট্ দেয়া লাইন বরাবর কেটে নাও।

HTA 2836

দু-তিনজন ডাক্তার-কবিরাজ···এ হল সবচেয়ে কঠিন ব্যাধি, ক্যান্সারের যেমন চিকিচ্ছে নেই, কাশিরোগেরও কোনও চিকিচ্ছে নেই!

কুলদা অবিরাম বকে-বকে, গাল পেড়ে-পেড়ে সুখদাকে খানিকক্ষণের জন্য রোদে বের করে আনল।

"মঙ্গলা, তোদেরকে রোদে বেরোতে বললাম যে! কথাটা কানেই যায়নি, ঠাণ্ডা ঘরে শুয়ে-শুয়ে গলানালী ফাটিয়ে কেশে যাচ্ছে!"

আরও অনেক ছোট-বড় গালাগাল দিতে হয়েছে তবে বাইরে বেরিয়েছে। সুখদা রোদে একটা থলে পেতে শুয়েছে। তার বুকটা ও পেটটা খালি উঠছে-পড়ছে।

কিন্তু রোদে খানিকক্ষণ থাকতে-থাকতে বেশ কাশিটাসি সব থেমে গেল। সে একবার গালিও দিয়ে নিল কুলদাকে, "মঙ্গলা, তুই শুনে রাখ, শুধু টেঁকে আছে আমার সব টাকা-পয়সা নিবে বলে, কখন আমি মরি! কিন্তু মঙ্গলা, ওতে হাত ছোঁয়াতে দিবিনে, গ্রামের লোকজন এলে বলবি যেন দেবমন্দিরে দান করে দেয়।"

কিন্তু সন্ধে থেকে আবার সেই কাশি।

সেই বুকের টান।

হাঁইপাঁই।

এক-একবার রেগে যায় কুলদা।

"মঙ্গলা, আবার একটা বড়ি খেয়ে নিতে বল! এরকম বুক হাঁসফাঁস করছে আর ওষুধ রেখে কী হবে? খাচ্ছে, না ফেলে দিচ্ছে তার ঠিক নেই!"

এরকম বলে-বলে, বকে-বকে সবগুলো বড়ি খাইয়ে ফেলল। জল গরম, তেল গরমের শেষ নেই। দশ মিনিট ছাড়া, পাঁচ মিনিট ছাড়া। না খেলে বা না তেল ঘষলে কুলদা প্রচণ্ড রাগারাগি করছে।

আর কত যে কষ্ট করে তেলের বাটি থেকে একটু তেল তোলে সুখদা···যখন নিশ্বাসটা ভেতরে গিয়ে কফের জন্য আটকে যায়, বেরোতে পারে না, তখনই ভেতরটাকে ছারখার করে দিয়ে কাশি আসে।

॥ ৩ ॥

অনেকক্ষণ হয়ে গেছে জল গরম তেল গরম আর দেওয়া হয়নি। ভুলে যায়নি, হঠাৎ নিজেরই বাতের যন্ত্রণা ভীষণভাবে চাড়া দিয়ে উঠেছে।

কুলদা নুয়ে-নুয়ে গেল উনুনশালের দিকে। ডিশের বাটিতে করে কোনওরকমে তেলটা গরম করে নিয়ে, ডিশের গ্লাসটা

আগুনে বসিয়ে এল, তেল নিতে-নিতে জল গরম হয়ে যাবে।

"মঙ্গলা, এবার বেশি গরম হয়নি, তাড়াতাড়ি নিয়ে নিতে বল, এক্ষুনি না নিলে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।"

তেলবাটিটা গলিয়ে দিল বেড়া দিয়ে। কিন্তু খানিক বাদেও নুয়ে পড়ে দেখল যেখানকার বাটি সেখানেই পড়ে আছে।

"ওরে ও মঙ্গলা, বলি ঠাণ্ডা হয়ে গেল যে, কী হল রে?"

আবার খানিকক্ষণ যায়।

"নিতে পারবে না, না কি রে?"

"ও মঙ্গলা!"

"না হলে আমার দিকে ঘুরে শুতে বল!"

হাতটা গলাচ্ছে, তেলে হাত ডোবাল।

"কী আর করব, না হলে চব্বিশ ঘণ্টা আমাকে····আরে ও মঙ্গলা, গা কেন এত ঠাণ্ডা লাগে রে···ও····"

তিরিশ বছর পর গায়ে হাত দিল সুখদার।

কিন্তু স্পর্শটা ঠিক বুঝতে পারল কুলদা। এই তো সেদিন ঠিক এরকম একটা ঠাণ্ডা স্পর্শ····কার?

অজু!

না, নদীর জল থেকে তোলা অজুর বাবা!

কুলদা ছুটে বাইরে বেরিয়ে এল। বাইরে অন্ধকার রাত তখন মাটির ওপরে তিন হাত পুরু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

মাথার হাত তিনেক দূরে লম্ফ জ্বলছে। মঙ্গলা শুয়ে আছে কোলের কাছে।

কুলদা বাতের যন্ত্রণায় কুঁকড়ে-কুঁকড়ে এসে সুখদাকে ঠেলল। তার গায়ে, নাকে-মুখে হাত দিয়ে দেখল, তারপর থরথর করে কাঁপতে-কাঁপতে একসময় ঝাঁপিয়ে পড়ল সুখদার ওপরে।

॥ ৪ ॥

খুব ভোর-ভোর এসেছে বুধু মাঝি, চালতা পাড়বে, চালতা পেড়ে বাজারে নিয়ে যাবে।

সে এসে ডাকল, "পিসি, ও বড়পিসি!"

সুখদার দরজা খোলা। বাইরে থেকে উঁকি দিয়ে দেখল সুখদা শুয়ে আছে। তার মুখ পর্যন্ত চাদর ঢাকা। ভোরের দিকে আজ একটু শীত পড়েছে।

বাইরে বেরিয়ে এল।

কুলদার দরজাও খোলা।

এখানেও উঁকি দিয়ে দেখল ঠিক সুখদার মতো কুলদাও কাপড় ঢাকা।

"বাবা, এত ডাকছি, ঘুম ভাঙছেনি যে গো! ও ছোটপিসি!"

সাত-আটটা ডাকল বুধু মাঝি। মাঝি এর ঘরে ঘাড় গলিয়ে, তার ঘরে ঘাড় গলিয়ে বড়পিসি-ছোটপিসি করে। একবারও কেউ সাড়া দিল না।

সে ঘরের মধ্যে ঢুকে চাদর তুলে দেখতে গেল। সুখদাকে দেখল—দাঁত নেই, এক পাটির ভেতরে আর-এক পাটি ঢুকে পাটি কামড়ে পড়ে আছে। চাপ-চাপ পিঁপড়ে নাকে-মুখে-চোখে।

ঘর থেকে দৌড়ে বেরিয়ে এসেছে বুধু মাঝি। কুলদার চাদর তুলে দ্যাখে, সেও একইরকম বীভৎসভাবে···

বুধু মাঝি চালতার ঝুড়ি ফেলে পাড়া-কাঁপিয়ে চিৎকার করে ওঠে।

এক-এক করে গোটা গ্রামের লোক জড়ো হল।

সকলে দেখল অনবরত মঙ্গলা বেড়া গলে-গলে একবার এদিকে আসছে, একবার ওদিকে আসছে।

মঙ্গলা একবার সুখদার গা-ঘেঁষে কাঁদে, একবার কুলদার গা-ঘেঁষে।

মঙ্গলার কাঁদা দেখেও সেদিন অনেকে কেঁদেছিল।

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

খেলাধুলো

আক্রম এখন সেরা ফাস্ট বোলার

সাফল্য এবং প্রতিভা দু'দিক দিয়েই বর্তমানে ফাস্ট বোলারদের মধ্যে সেরা ওয়াসিম আক্রম। আলোচনা করেছেন **সমীরণ সেন**

যে-কোনও সময়ই বিধ্বংসী হয়ে উঠতে পারে আক্রমের বল। তীব্র গতি, সুইং ও নিয়ন্ত্রণের জন্য তাঁর বল সবসময়ই ব্যাটসম্যানের সমীহ আদায় করে নেয়। ফাস্ট বোলারদের মধ্যে তিনিই এখন সেরা। তার ওপর আবার ব্যাটেও বেশ দাপট দেখান আক্রম। ছক্কা মারতে তাঁর জুড়ি মেলা ভার। যে কোনও ব্যাটসম্যানকে যেমন আউট করার ক্ষমতা রাখেন, তেমনই যে কোনও বোলারের বলেই অবলীলাক্রমে মারতে পারেন ওভারবাউন্ডারি।

পাকিস্তান ক্রিকেট দল একটা ব্যাপারে বিশ্বের প্রায় সব দেশকেই টেক্কা দিচ্ছে। যথার্থ দ্রুত বা ফাস্ট বোলারের সংখ্যা এখন সে-দেশেই সর্বাধিক। ফাস্ট বোলারের পীঠস্থান ওয়েস্ট ইন্ডিজের কথা মনে রেখেও এ-কথা বলতে হচ্ছে। ম্যালকম মার্শালের যোগ্য সহযোগী অ্যামব্রোস, ওয়ালস, বিশপরা সমীহ আদায় করেছেন বিশ্বের প্রায় সব ব্যাটসম্যানেরই। পিছিয়ে নেই ইংল্যান্ডের ম্যালকম, ফ্রেজার বা লুইস, অস্ট্রেলিয়ার অল্ডারম্যান বা রেকোম্যান। কিন্তু প্রতিভা এবং সাফল্যের দিক দিয়ে অনেকটাই এগিয়ে রয়েছেন পাকিস্তানের তরুণ ওয়াসিম আক্রম। তাঁর সঙ্গে আছেন আরও একঝাঁক তরুণ বোলার: ওয়াকার ইউনুস, আকিব জাভেদ, শাহিদ সঈদ প্রমুখ। এদের মধ্যে আবার ইউনুস এখন দারুণ বল করছেন। ইমরান খানের পর এখন পাকিস্তানের আক্রমণ মূলত চব্বিশ বছরের ওয়াসিম আক্রমের ওপর নির্ভরশীল। বলে তিনি এখন নেতৃত্ব দেন, ইমরান খেললেও আক্রমই এক নম্বর বোলার। বলের গতি, ধার এবং বৈচিত্র্যে অনেক বিখ্যাত বোলারকে পেছনে ফেলে দিয়েছেন আক্রম। এজন্যই তাঁকে এখন পাকিস্তানের কেন, বিশ্বেরই সেরা ফাস্ট বোলার বলা যায়। এবং এ-কথা বলায় সত্যিই কোনও ঝুঁকি নেই। কারণ প্রায়-অস্তমিত ইমরান, মার্শাল এবং কপিলদেবই একমাত্র তাঁদের সময়ে তাঁকে চ্যালেঞ্জ করতে পারতেন। এখন আর সম্ভব নয়।

আক্রমের উত্থান আকস্মিক। একটিমাত্র প্রথম শ্রেণীর ম্যাচ খেলেই তিন মাসের মধ্যে তিনি ১৯৮৪ সালের নিউজিল্যান্ড সফরে দলে স্থান পেয়ে যান। সেই প্রথম ম্যাচটিতে অবশ্য আক্রম ৯টি উইকেট নিয়েছিলেন। অকল্যান্ডে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে অভিষেকের পরের টেস্টেই ১০টি উইকেট তুলে নেন আক্রম। তারপর আর ছ' ফুট এক ইঞ্চি লম্বা এই ফাস্ট বোলারকে পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি।

অস্ট্রেলিয়ায় বিশ্ব ক্রিকেট সিরিজে আক্রম দুর্দান্ত বল করেন। ইমরান যথার্থ একজন সহযোগী পেয়ে যান। মুগ্ধ ইমরান বলেন, "অ্যালান ডেভিডসনের পর আক্রম বিশ্বের সেরা বাঁ-হাতি ফাস্ট বোলার হতে যাচ্ছে। ওর বলের কন্ট্রোল এত ভাল যে, যেখানে বল ফেলতে বলা হবে, সেখানেই ফেলতে পারে। সবচেয়ে বড় কথা, মানসিকতা। মার খেলেও ধৈর্যচ্যুতি ঘটে না। যা বড় হওয়ার লক্ষণ।"
পরবর্তীকালে দেখা গেছে, ইমরানের কথাই ঠিক।

বিপক্ষে দেশকে দারুণ সাফল্য এনে দেন আক্রম। ইংল্যান্ডের কাউন্টি ক্রিকেটে খেলে এবং ইমরানের পরামর্শকে কাজে লাগিয়ে নিজেকে আরও পরিমার্জিত করে নিয়েছেন আক্রম। মধ্যে কিছুদিন আহত থাকার পর আক্রম এখন আবার তাঁর ফর্মে ফিরে এসেছেন। নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে সিরিজ শুরুই করলেন প্রথম টেস্টে ৮টি উইকেট নিয়ে।

সুদর্শন আক্রমের এই বিধ্বংসী ফর্ম যদি বজায় থাকে, তবে খুব শিগগিরই বিশ্বের বহু ব্যাটসম্যানই তাঁকে আর দর্শন করতে চাইবেন না।

ইমরানের সঙ্গী হয়েছিলেন আক্রম, আর আক্রম সঙ্গী হিসেবে পেয়েছেন আঠারো বছরের তরুণ ওয়াকার ইউনুসকে। বিশ্বে এখন সবচেয়ে জোরে বল করেন বোধ হয় ইউনুসই। মুলতানের বেহারি জেলায় জন্ম হলেও ওয়াকারের ছেলেবেলা কেটেছে আবু ধাবিতে। ওয়াকারের বাবা সেখানে কাজ করতেন। পরে তিনি পাকিস্তানে আবার ফিরে আসেন। তাঁর টেস্ট অভিষেক গত বছর ভারতের বিপক্ষে, করাচিতে। শুরু থেকেই নজর কাড়েন ইউনুস। ইমরানের মতে, বলের ওপর ইউনুসের নিয়ন্ত্রণ কিছুটা কম, সেটা ঠিক করতে পারলে ওঁকে রোখা মুশকিল হবে। বল একটু পুরনো হলে তবেই ইমরান তাঁকে এখন ব্যবহার করছেন। প্রচণ্ড জোরের

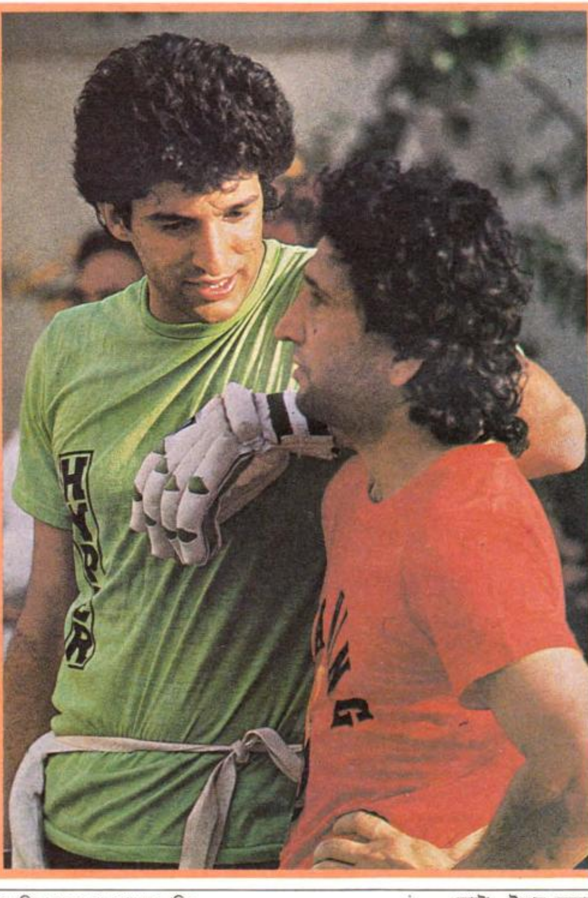

ওয়াকার ইউনুস সবচেয়ে জোরে বল করেন। ইমরানের পর তিনিই এখন আক্রমের জুটি। পাকিস্তান সফরে নিউজিল্যান্ডের কোনও ব্যাটসম্যানই ওয়াকার ইউনুসের বল ভালভাবে খেলতে পারেননি। আক্রমের পর ওয়াকার ইউনুসই হবেন পাকিস্তানের সেরা ফাস্ট বোলার।

সঙ্গে এখন সুইংটাও ভাল করান ওয়াকার। সারে কাউন্টিতে খেলে নিজের খেলার দারুণ উন্নতি করেছেন তিনি। এই মরসুমে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে শুধু আক্রমই নন, ওয়াকারও সাফল্য পেয়েছেন।

সবে টেস্ট-অঙ্গনে ঢুকে এই যে প্রতিশ্রুতি জাগিয়েছেন ওয়াকার ইউনুস, তাতে অনেকেই ভাবছেন ইমরান খান পুরোপুরি সরে গেলে দলের বোলিং দায়িত্ব তাঁকেই ভাগ করে নিতে হবে আক্রমের সঙ্গে। এবং আর কয়েক বছরের মধ্যে আক্রম ও ইউনুসের জোড়া ফলা যে বিপক্ষের আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়াবে, তা এখনই বলা যায়। একজন বর্তমানের সেরা, অন্যজন ভবিষ্যতের—সুতরাং আতঙ্কটা অমূলকও নয়।

ওয়াসিম আক্রম ও আব্দুল কাদির

ফোটো : উৎপল সরকার

সার রিচার্ড হ্যাডলি ও
শচীন তেণ্ডুলকর
ফোটো : উৎপল সরকার

ডেভিস কাপ ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার বড় ভরসা প্যাট ক্যাশ

আসন্ন ডেভিস কাপ ফাইনাল নিয়ে
লিখেছেন **অনির্বাণ দত্ত**

ডেভিস কাপ ফাইনালে টেনিসের দুর্দান্ত লড়াই দেখার জন্য এখন থেকেই সবাই অপেক্ষা করছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অস্ট্রেলিয়ার এই লড়াইয়ে আমেরিকার তরুণ আন্দ্রে আগাসি ও মাইকেল চ্যাংকে হারাতে রীতিমত বেগ পাবেন অস্ট্রেলিয়ার প্যাট ক্যাশ। ক্যাশই অস্ট্রেলিয়ার লড়াইয়ের প্রধান অস্ত্র। প্রাক্তন উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ান প্যাট

আন্দ্রে আগাসি

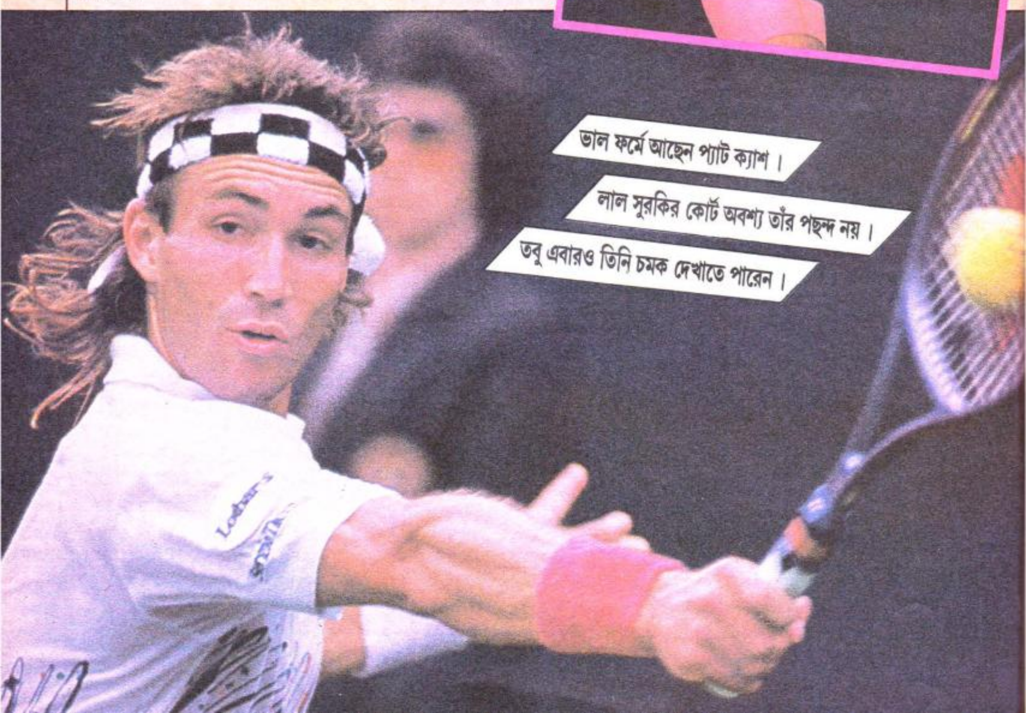

প্যাট ক্যাশ

ক্যাশ মাঝখানে বেশ কয়েক বছর একেবারেই ফর্মে ছিলেন না। টেনিস ছাড়াও তিনি পপ গান নিয়ে মেতে ছিলেন। এখন আবার টেনিসের দিকেই পুরোদস্তুর মন দিয়েছেন। ডেভিস কাপ জিততে হলে প্যাট ক্যাশের ওপরেই মূলত নির্ভর করতে হবে অস্ট্রেলিয়াকে।

তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও সহজে হাল ছেড়ে দেবে না। এ পর্যন্ত ৫৪ বার ডেভিস কাপ ফাইনালে উঠেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। জিতেছে ২৮ বার। ১৯৮২-র পর থেকে তারা আর ডেভিস কাপ জেতেনি। সুতরাং এ-বছর তারা চেষ্টার ত্রুটি করবে না বলেই মনে হয়। কোন দেশ টেনিসে সেরা, তা ডেভিস কাপের ফাইনালেই প্রমাণ হয়ে যায়। এবার যে-দেশ জিতবে সেই দেশকেই টেনিসে সেরা বলতে হবে। ডেভিস কাপে জয়-পরাজয়ের পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অস্ট্রেলিয়ার তুলনায় ২৩-১৮ এগিয়ে আছে। ১৯৮৬ সালে ডেভিস কাপের সেমিফাইনালে এই দুটি দেশ শেষবার পরস্পরের বিরুদ্ধে খেলেছে। সেই খেলায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হেরে যায়। এবার সেই হারের বদলা নেওয়ার সুযোগ এসেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামনে। এবং সুযোগটা এসেছে ডেভিস কাপের ফাইনালে। ফাইনালে অস্ট্রেলিয়াকে হারাতে পারলে সেটা হবে আরও বড় কৃতিত্বের ব্যাপার।

খেলা হবে লাল সুরকির সারফেস-এ। এটা অবশ্য অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়দের মনঃপূত নয়। কারণ, অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়রা খেলেন 'পাওয়ার টেনিস'। তাঁরা চান ঘাসের কোর্ট। এ-বছর ডেভিস কাপের তিনটি খেলা তাঁরা খেলেছেন, সব ক'টিই ঘাসের কোর্টে। পাওয়ার টেনিসের মূল কথা 'সার্ভ' ও 'ভলি'। লাল সুরকির কোর্টে আন্দ্রে আগাসি ও মাইকেল চ্যাংয়ের মতো বেসলাইন খেলোয়াড়রা পাবেন বাড়তি সুবিধে।

ফাইনাল হবে ফ্লোরিডার সেন্ট পিটার্সবুর্গ-এ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হয়ে ডাবলস খেলবেন রিকলিচ ও জিম পাস। সেমিফাইনালে অস্ট্রিয়াকে ৩-২ ম্যাচে হারিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। সেই বিজয়ী দলের চার খেলোয়াড়কেই ফাইনালে রেখেছেন অধিনায়ক টম গোরম্যান। তিনি 'নন-প্লেয়িং ক্যাপ্টেন'। অস্ট্রিয়ায় ওই সেমিফাইনাল খেলাও হয়েছিল 'ক্লে' কোর্টে। সুতরাং ক্লে কোর্টে এবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে হারানো কঠিন হবে বলেই মনে হচ্ছে।

ফাইনালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের খেলোয়াড় বাছাইয়ের ব্যাপারটি ইতিমধ্যেই সবার নজর কেড়েছে। মার্কিন ওপেন চ্যাম্পিয়ান পিট সাম্প্রাস এবং জন ম্যাকেনরো, ব্রাড গিলবার্ট ও আরন ক্রিকস্টেন-এর মতো শীর্ষস্থানীয় খেলোয়াড়দের বাদ দিয়ে দলে নেওয়া হয়েছে মাইকেল চ্যাংকে। অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে ফাইনাল ম্যাচে দুটি সেট পিছিয়ে থেকেও চ্যাং জিতে যান। ওই খেলায় তিনি দেখিয়েছিলেন অসাধারণ সাহস ও লড়াইয়ের ক্ষমতা। এইজন্যই হয়তো মাইকেল চ্যাংকে দলে রাখা হয়েছে।

দুরন্ত সাহসের জন্য দলে রাখা হয়েছে চ্যাংকে

আগেই বলা হয়েছে, অস্ট্রেলিয়ার বড় ভরসা প্যাট ক্যাশ। ১৯৮৩ এবং ১৯৮৬-তে অস্ট্রেলিয়ার জয়ে তিনি নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এবারও অস্ট্রেলিয়া ক্যাশের দিকে তাকিয়ে আছে। ওয়ালি মাসুর, ডারেন কাহিল ও রিচার্ড ফ্রমবার্গ-এর মধ্যে যে-কোনও একজন খেলবেন সিঙ্গলসে।

ডাবল্‌সে অস্ট্রেলিয়ার জুটি ডারেন কাহিল ও মার্ক কার্ত্জমান। অস্ট্রেলিয়ার কোচ নিল ফ্রেজার বলেছেন, "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যদিও সবচেয়ে বেশিবার ডেভিস কাপ জিতেছে, তা হলেও তাদের অপরাজেয় মনে করার কারণ নেই। তবে, আমাদের একটাই দুঃখ। দেশের মাটিতে আমাদের সমর্থকদের সামনে খেলার আনন্দটাই আলাদা। সেই সুযোগ আমরা পেলাম না।"

লাল সুরকির এই সারফেস নিয়ে আপত্তি জানিয়েছেন প্যাট ক্যাশ। লাল সুরকি আবার আনা হয়েছে জার্মানি থেকে। অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়রা মনে করেছেন, তাঁদের হারানোর জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কোনও ঝুঁকিই নিতে চাইছে না। সেইজন্যই লাল সুরকির এই কোর্ট। এই ধরনের কোর্টে খেলার আয়োজনটা অবশ্য নিয়মবিরুদ্ধ নয়। আয়োজক দেশ হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিছু বাড়তি সুবিধে পাবেই। তবু অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়রা সহজে হার স্বীকার করবেন বলে মনে হয় না। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের খেলোয়াড়দের বড় সম্পদ তাঁদের তারুণ্য। এই তারুণ্যের জোরেই আগাসি ও চ্যাং যে কোনও খেলোয়াড়কে হারানোর ক্ষমতা রাখেন। অন্যদিকে, প্যাট ক্যাশ তাঁর সেরা দিনগুলি পেছনে ফেলে এসেছেন। একটাই আশার কথা, এ-বছর তিনি ভাল খেলছেন। সুতরাং ডেভিস ফাইনাল যে জমবে এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই।

শতাব্দীর সেরা দাবার লড়াই

বিশ্ব-দাবার খেতাবি লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত কে জিতবেন ? কাসপারভ, না করপোভ ? আলোচনা করেছেন **সব্যসাচী সরকার**

নিউ ইয়র্ক শহরের মানহাটন-এর একটি বিখ্যাত থিয়েটার । ছোট্ট একটি টেবিলের ওপরে সাদা-কালো রং করা ৬৪টি বর্গক্ষেত্র নিয়ে একটি দাবা বোর্ড । পাশে একটি বাক্সের মতো ঘড়ি । টেবিলের দু'ধারে গম্ভীর মুখে বসে রয়েছেন কালো কোট পরা দুই দাবাড়ু । সারা ঘরে নিস্তব্ধতা, একটা পিন পড়লেও শোনা যাবে তার শব্দ । দর্শকাসন মাত্র ৭০০ । তবু এই থিয়েটার হলের ওই দাবা বোর্ডের দিকেই তাকিয়ে রয়েছে সারা বিশ্ব । ইতালির ফুটবল লিগে যেমন ইন্টার মিলান বনাম এ· সি· মিলান, বিশ্ব-ক্রিকেটে যেমন ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়া, টেনিসে যেমন স্টেফি-মার্টিনা, বিশ্ব-দাবায় তেমনই করপোভ বনাম কাসপারভ । এই দু'জনের মধ্যে চলছে বিশ্ব-দাবার খেতাবি লড়াই । ২৭ বছর বয়সী কাসপারভ কি অক্ষুণ্ণ রাখতে পারবেন তাঁর খেতাব ? না কি ৩৯ বছর বয়সী করপোভ আবার উদ্ধার করবেন তাঁর পাঁচ বছর আগের হারানো মুকুট ?

এই দুই রুশ দাবাড়ুর সম্পর্ক মোটেই ভাল নয় । একেবারে যেন আদায়-কাঁচকলায় । মানুষ হিসেবেও দু'জনে ভিন্ন মেরুর । গ্যারি কাসপারভ কেমন মানুষ ? এক কথায় ছটফটে, হাসিখুশি, প্রাণবন্ত এক যুবক । সাংবাদিকদের হাজারো প্রশ্নের মুখোমুখি হতে তিনি এক কথায় রাজি । কথাবার্তায় দারুণ সপ্রতিভ,বর্তমান বিশ্বচ্যাম্পিয়ান । গড়গড় করে ইংরেজি বলাই হোক, বা উঠতি দাবাড়ুদের খেলা শেখানোই হোক, সবেতেই কাসপারভ অদ্বিতীয় । প্রাক্তন বিশ্বচ্যাম্পিয়ান ববি ফিশারের মতো খামখেয়ালি নন গ্যারি । করপোভের মতো অন্তর্মুখীও নন । জীবনকে উপভোগ করতে ভালবাসেন তিনি । দাবায় বিশ্বসেরা হয়েই সন্তুষ্ট থাকতে চান না, খেলাটাকে ছড়িয়ে দিতে চান সারা দুনিয়ায় । প্রাক্তন বিশ্বচ্যাম্পিয়ান মিখাইল বোটভিনিক-এর মতো শেখানোর কাজে প্রচুর সময় ব্যয় করেন তিনি । মস্কোর কম্পিউটার ক্লাবের চেয়ারম্যান কাসপারভ । তাঁর নিজের টাকায় কেনা কম্পিউটারে দাবার খুঁটিনাটি

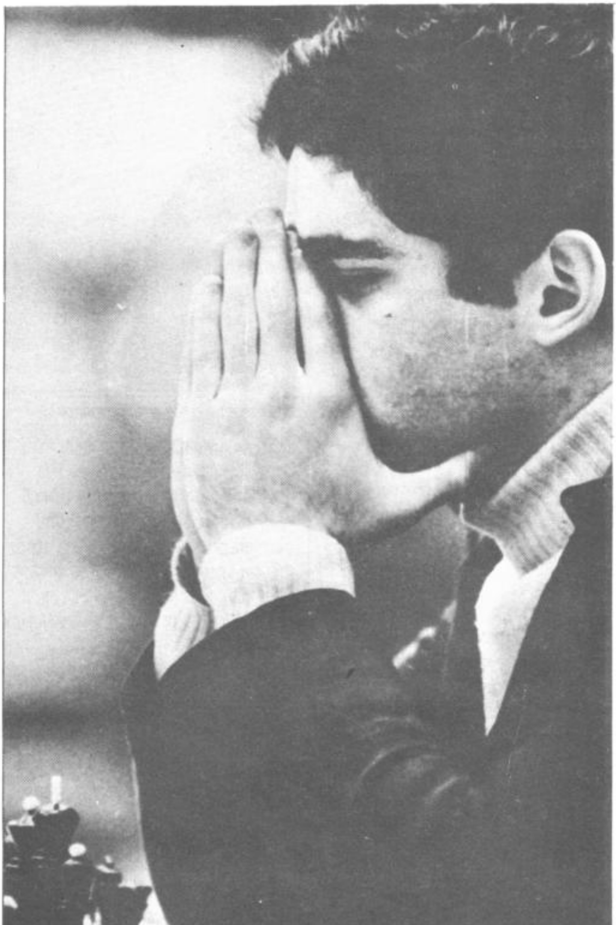

কাসপারভ : তিরিশ বছর পেরনোর আগেই ঝকঝকে সপ্রতিভ এক বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ান

করপোভ : চিরকাল দাবাতেই আত্মনিমগ্ন, অন্তর্মুখী এক চরিত্র

শেখে প্রায় ন'শো ছাত্রছাত্রী। এদের প্রত্যেকেই স্কুলের পড়ুয়া। মস্কোয় এই ক্লাব এতই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে যে, কাসপারভ অন্যান্য দেশেও এই ধরনের ক্লাব খোলার কথা ভাবছেন। শুধু খেলা শেখানোই নয়, বাচ্চাদের আরও নানাভাবে সাহায্য করতে কাসপারভ সবসময়ই এগিয়ে আসেন। তাঁর চেষ্টাতেই খোলা হয়েছে চাইল্ডস ফাউন্ডেশনের বিশেষ তহবিল, বিশ্বের শিশুদের প্রয়োজনে আর্থিক সাহায্য করাই যার উদ্দেশ্য। ছোটদের পরামর্শ দেওয়ার ব্যাপারে খুবই আগ্রহী কাসপারভ। দাবায় বিশ্বচ্যাম্পিয়ান হওয়ার স্বপ্ন সফল করতে গেলে একজন উঠতি দাবাড়ুর কী কী দরকার ? কাসপারভের মতে, "গোড়ার কথা হল, খেলাটাকে ভালবাসতে হবে, অভিভাবকদের চাপে পড়ে নয়, মন থেকে। তারপরেই যেটা সবচেয়ে বেশি দরকার, সেটা হল একজন পেশাদার কোচের, যিনি শিক্ষার্থীর দোষ ও গুণগুলো বিশ্লেষণ করতে পারবেন। প্রতিভা থাকলে ভালই, কিন্তু গ্র্যান্ডমাস্টার পর্যায়ে ওঠার জন্য প্রতিভাবান দাবাড়ুরও প্রয়োজন ভাল কোচের।" আত্মজীবনী 'চাইল্ড অব চেঞ্জ' বইটিতে ভাল দাবাড়ু হওয়ার জন্য কী কী দরকার তা কাসপারভ বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

কাসপারভের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী আনাতোলি করপোভের খেলার ধরন একেবারেই আলাদা। দু'জনের জীবনধারাও একেবারেই মেলে না। কাসপারভ দাবা ছাড়াও বই লেখা, ভ্রমণ, দাবার স্কুল ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। কিন্তু করপোভ ? তিনি শুধু নিজের দাবা নিয়েই মগ্ন। খেলার সময় একেবারেই ঝুঁকি নেওয়ার পক্ষপাতী নন প্রাক্তন বিশ্বচ্যাম্পিয়ান। নিজের ঘর আগে সামলাও, তারপর আক্রমণে যাও—এই নীতিতে তিনি বিশ্বাসী। খুব ভেবেচিন্তে চাল দেন তিনি। কাসপারভ যে ভেবেচিন্তে চাল দেন না এমন নয়। তবে আক্রমণই তাঁর কাছে রক্ষণের শ্রেষ্ঠ পন্থা। প্রথম সুযোগেই আঘাত হেনে প্রতিপক্ষকে বেসামাল করে দিতে ভালবাসেন তিনি। এভাবে খেলেই ১৯৮৫ সালে করপোভের কাছ থেকে খেতাব কেড়ে নেন তিনি। দশ বছর বিশ্বচ্যাম্পিয়ান থাকার পর অভিজ্ঞ করপোভকে হার স্বীকার করতে হয়। উল্লেখ্য, এঁরা দু'জনে প্রথম মুখোমুখি হন আজ থেকে ছ' বছর আগে। সেই থেকে এবারের লড়াইয়ের আগে পর্যন্ত দু'জনে ১৩০টি গেম খেলেছেন। পাল্লা ভারী কিন্তু কাসপারভের দিকেই। তিনি এক গেম এবং দু' পয়েন্টে এগিয়ে রয়েছেন।

দাবা-যুদ্ধের সঙ্গে-সঙ্গে দু'জনের মধ্যে কথার যুদ্ধও যথারীতি শুরু হয়ে গেছে। কাসপারভ বলেছেন, এই ম্যাচটা তিনি করপোভকে এমনভাবে হারাতে চান যাতে আর কখনও তাঁর সঙ্গে খেলতে না হয়। করপোভও চুপ করে থাকেননি। তিনি বলেছেন, খেতাব পুনরুদ্ধার করার ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত। দাবা বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন

করপোভ-কাসপারভের এই লড়াই শতাব্দীর সেরা লড়াই হিসেবে চিহ্নিত হবে। এদিকে খেলা শুরুর আগেই দু'জনে পরস্পরের বিরুদ্ধে চাঞ্চল্যকর অভিযোগ এনেছিলেন। কাসপারভের অভিযোগ, তাঁর স্ট্র্যাটেজি জানবার জন্য অসৎ উপায়ে নানা চেষ্টা চালানো হয়েছে। করপোভ অবশ্য এসব অভিযোগ মিথ্যে বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। মোট কথা, ৩০ লক্ষ ডলার পুরস্কার মূল্যের এই দাবা চ্যাম্পিয়ানশিপ দারুণ জমে উঠেছে। যিনি জয়ী হবেন তিনি পাবেন ১৭ লক্ষ ডলার এবং যিনি হারবেন তিনি পাবেন ১৩ লক্ষ ডলার।

খেতাবি লড়াইয়ের নিয়মগুলো অন্যান্যবারের মতো একই রয়েছে। আগে যিনি ১২·৫ পয়েন্ট সংগ্রহ করতে পারবেন তিনিই জিতবেন খেতাব। পয়েন্ট যদি ১২-১২ হয় খেতাব থাকবে বর্তমান চ্যাম্পিয়ানের কাছেই। ২৪টি গেমের প্রথম ১০-১২টি হচ্ছে নিউ ইয়র্কে। নভেম্বরের ২৩ তারিখ থেকে ফ্রান্সের লিঁয়তে শুরু হবে বাকি গেমগুলোর।

বছর দুয়েক আগে গ্র্যান্ডমাস্টার ডেমেস প্ল্যাসকেট তাঁর 'প্লেয়িং টু উইন' বইয়ে লিখেছিলেন, দাবা খেলাটা আর-পাঁচটা খেলার মতো নয়। এখানে ক্রীড়াকুশলতার চেয়েও বেশি দরকার মানসিক শক্তি। দাবা হল যুদ্ধ। মানসিক শক্তির পরীক্ষা। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, এবারের লড়াইয়ে যাঁর স্নায়ু বেশি চাপ নিতে পারবে তিনিই শেষ পর্যন্ত জয়ী হবেন। নিউ ইয়র্কের ব্রডওয়ে থেকে এই দাবা-যুদ্ধের উত্তাপ দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বে, যার আঁচ আমরাও পাচ্ছি এই ভারতে বসে।

নিল ফ্রেজার

অস্ট্রেলিয়ার ডেভিস কাপ দলের অধিনায়ক নিল ফ্রেজার আরও দু' বছর অধিনায়ক থাকবেন। সম্প্রতি এই মর্মে চুক্তি হয়েছে। পুরো মেয়াদ থাকলে নিল ফ্রেজার একটা রেকর্ড করবেন। অস্ট্রেলিয়ার টেনিস দলের অধিনায়কত্বের রেকর্ড। এর আগে এই রেকর্ড ছিল হ্যারি হপম্যানের, ২০ বছরের। এই রেকর্ড ভাঙতে চলেছেন ফ্রেজার। ফ্রেজার ১৯৭০ সালে দলের দায়িত্ব নেন, চারবার দেশকে ডেভিস কাপের ফাইনালে তোলেন। যদিও তিনি এখন নন-প্লেয়িং ক্যাপ্টেন, দলকে উদ্বুদ্ধ করার ক্ষেত্রে ফ্রেজারের অবদান অপরিসীম।

ইরাক বাদ

আগামী বছরের ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতায় খুব সম্ভবত ইরাককে বাদ দেওয়া হবে। ডেভিস কাপ সংগঠন কমিটির প্রধান জানিয়েছেন, "যদি ইরাক কুয়েত থেকে আগামী ডিসেম্বর মাসের মধ্যে তাদের সৈন্যদল প্রত্যাহার না করে, তবে এই অন্যায় আচরণের জন্য ডেভিস কাপে তারা অংশ নিতে পারবে না।" গত এশিয়ান গেমসেও একই কারণে তাদের বাদ দেওয়া হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, ১৯৮০ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা ছাড়া আজ পর্যন্ত আর কোনও দেশকে ডেভিস কাপ থেকে বহিষ্কার করা হয়নি। আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে ১৯৯১ সালের ডেভিস কাপ শুরু হচ্ছে। ৮৮টি দেশের এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার কথা।

ভাই-ভাই

খেলায় যতই এগিয়ে থাক, প্রশাসনিক সিদ্ধান্তে কিন্তু ভারত ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট বোর্ডের মধ্যে যথেষ্ট মিল আছে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বোর্ড সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, ক্লাইভ লয়েডকে আর ক্রিকেট ম্যানেজার রাখা হবে না। লয়েড যখন এই খবরটা শোনেন, তখন তিনি লণ্ডনে। ক্ষুব্ধ লয়েড বলেছেন, "আমি দেশে ফিরলে এই সিদ্ধান্তটা জানালে চলত না?" এ-ধরনের কথা কি আমরা বহু ভারতীয় অধিনায়কের মুখেও আগে শুনিনি? দেখা যাচ্ছে, কোনও-কোনও ব্যাপারে ক্যারিবিয়ান ও ভারতীয় কর্তারা ভাই-ভাই।

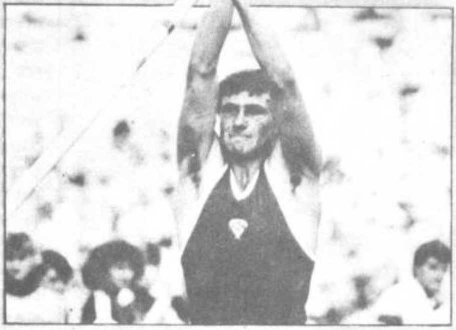

রাগিতং

অ্যাথলেটিক্স জগতে পোলভল্টার সের্গেই বুবকা একটি শ্রদ্ধেয় নাম। শুধু তাঁর দক্ষতার জন্যই নয়, তাঁর স্বভাবও মুগ্ধ করার মতো। তাঁর বহু ভক্তের মধ্যে ছিলেন বিশ্বের আর-এক শীর্ষস্থানীয় পোলভল্টার রডিন গাতাউলিন। কিন্তু হঠাৎই গত বছর এই সম্পর্কে চিড় ধরে। দু'জনে বিবাদে জড়িয়ে পড়েন। তারপর থেকে বুবকাকে হারানোই গাতাউলিনের জীবনের ধ্যান-জ্ঞান হয়ে পড়ে। এমনকী কোনও প্রতিযোগিতায় জেতাটাও এখন তাঁর কাছে বড় নয়। তিনি বলেছেন, "জয় পেলে তো ভাল কথা, কিন্তু যদি দেখা যায় কোনও প্রতিযোগিতায় আমি সপ্তম হয়েছি আর বুবকা অষ্টম, তা হলেও আমি অখুশি হব না!"

অন্যরকম

এবারের যুক্তরাষ্ট্র ওপেন জয়ী তরুণ পিট সাম্প্রাস সম্পর্কে টেনিস-বিশেষজ্ঞরা উচ্ছ্বসিত। প্রবাদপুরুষ, তিরিশের দশকের তিনবারের উইম্বলডন জয়ী ফ্রেড পেরি বলেছেন, "এত ভাল সার্ভ আমি বহুদিন দেখিনি এবং আগামী কুড়ি বছরের মধ্যেও দেখব বলে মনে হয় না। ওর খেলার স্টাইল আমাদের ফেলে-আসা দিনগুলো মনে পড়িয়ে দেয়।" সাম্প্রাস নিজে বলেছেন, "হ্যাঁ, আমি পুরনো ধ্যান-ধারণায় বিশ্বাসী। খেলাতেও। শান্ত স্বভাব আমার। চাপ সহ্য করতে পারি না। অবশ্য জানি, জয়ী হওয়ার জন্য নানা মানসিক চাপও এখন থেকে আমাকে সহ্য করতে হবে। সবাই চাইবে জিতি। কিন্তু খেলার স্টাইল বদলাতে পারব না। আধুনিক মানসিকতার আক্রমণাত্মক টেনিস খেলব না কখনও। আমি অন্যরকম।" অন্যরকম বলেই হয়তো বর্তমানের আর-এক সেরা ইভান লেণ্ডল তাঁকে নিজের বাড়িতে নিয়ে যান। তাঁকে নিয়ে প্র্যাকটিস করেন, টিপ্‌স দেন। এখনকার তীব্র প্রতিযোগিতার যুগে এসব অবাস্তব মনে হয়। সুভদ্র সাম্প্রাস অন্যরকম বলেই হয়তো লেণ্ডল তাঁর অনুরাগী হতে পেরেছেন।

রক্ষাকর্তা

ইংল্যান্ডের ক্রিকেট লিগে একটি ঘটনা ঘটে গেল, অন্যরকমই বলা যায়। মার্টলে ক্লাবের পক্ষে ব্যাট করছিলেন পল উইলিয়ম্‌স। প্রচণ্ড আঘাত পাওয়ায় তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। মাথায় ছ'টি সেলাইও করতে হয়। ডাক্তার ছিলেন ডেভিড উইলসন, বোলার ফিল উইলসনের বাবা, যাঁর বলেই পল আহত হয়েছিলেন।

অনিশ্চিত

দুই জার্মানি এক হওয়ার পর অনেকে যেমন খুশি, ক্রীড়াজগতের অনেকেই তেমনই শঙ্কিত ভবিষ্যতের কথা ভেবে। যেমন, বিশ্ব রেকর্ডধারী মহিলা জ্যাভেলিন থ্রোয়ার পিটার ফালকে। ফালকে ১৯৯২ সালের বার্সিলোনা ওলিম্পিকের পর অবসর নেবেন ঠিক করেছিলেন। তারপর পূর্ব জার্মানির প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েদের প্রশিক্ষণের কাজে যোগ দেওয়াও ঠিক ছিল। কিন্তু এখন কী হবে? ফালকে বলেছেন, "আমি এমন একটা অবস্থায় বড় হয়েছি, যেখানে সব কিছুই নিয়ম মেনে করা হয়, এবং আগে থেকেই সমস্ত কাজ ঠিক করে রাখা হয়। কিন্তু এখন ওই নিয়ম হয়তো অচল হয়ে যাবে। টাকা প্রচুর পাওয়া যাবে ঠিকই, কিন্তু তার জন্য প্রচুর প্রতিযোগিতায় নামতে হবে। কিন্তু ওইভাবে তো আমি তৈরি হইনি। বিক্রি করার খেলা আমি জানি না।" সুতরাং অনিশ্চিত জীবনে ঝাঁপাতেই হবে ফালকেকে।

সেই বর্গ কি আর ফিরতে পারবেন

বিয়র্ন বর্গ জানিয়েছেন, তিনি আবার প্রতিযোগিতামূলক টেনিস খেলবেন। কিন্তু তাঁর সেই আগের ফর্মে কি খেলতে পারবেন ? আলোচনা করেছেন **সুজিত রায়**

খবরটা বিশ্বের বহু পত্রিকায় প্রকাশ হওয়া মাত্রই আলোড়ন তুলেছে। পর-পর পাঁচবার উইম্বলডন এবং ছ'বারের ফ্রেঞ্চ ওপেন বিজয়ী বিয়র্ন বর্গ আবার প্রতিযোগিতামূলক টেনিসের আসরে ফিরে আসছেন। বর্গ অবশ্য শুধু ফ্রেঞ্চ ওপেন বা উইম্বলডন জয়ীই নন, এই শতাব্দীর অন্যতম সেরা টেনিস খেলোয়াড়ও। আট বছর আগে, মাত্র ২৬ বছর বয়সে, ফর্মের তুঙ্গে থাকতে-থাকতে যেমন হঠাৎই টেনিস ছেড়ে দেন, তেমনই হঠাৎ আবার ফিরে আসার প্রস্তুতি নিচ্ছেন বর্গ। কয়েক সপ্তাহ আগে, লন্ডনের একটি অভিজাত ক্লাবে নিয়মিত কয়েক ঘণ্টা অনুশীলনও শুরু করেছেন তিনি।

খবরটা পেয়ে একটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সংস্থা ইতিমধ্যেই লন্ডনের রয়াল অ্যালবার্ট হল আগাম ভাড়া করার ব্যবস্থা করছেন। তাঁদের ইচ্ছে, আগামী ডিসেম্বর মাসে বর্গ সেখানে একটি টুর্নামেন্ট খেলুন। সেই সংস্থার প্রধান ডেভিড হোয়াইটহেড বলেছেন, "বর্গ যদি সত্যিই খেলেন, তবে দর্শকরা একটা দারুণ খেলা দেখতে পাবেন।" যদিও সেটা হবে প্রদর্শনী খেলা। এ-ব্যাপারে তিনি বর্গের এজেন্টের সঙ্গে খুব শিগগিরই কথা বলবেন। বর্গ নিজে কিন্তু শুধু প্রদর্শনী ম্যাচ খেলতে রাজি নন, তিনি চান পুরোদস্তুর প্রতিযোগিতায় নামতে। সুইডেনের একটি খবরের কাগজে এক সাক্ষাৎকারে বর্গ জানিয়েছেন, "আমি যখন ভালই খেলতে পারছি, তখন কেন শুধু-শুধু প্রদর্শনী ম্যাচে অংশ নিতে যাব, আমি প্রথম শ্রেণীর টুর্নামেন্টগুলোয় অংশ নিতে চাই।"

বর্গের যুক্তি হয়তো সঙ্গত, কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এই ৩৪ বছর বয়সে তিনি কি তাঁর পুরনো ফর্ম ফিরে পাবেন ? কিংবদান্তির বর্গকে কি আমরা দেখতে পাব ? এটা সত্য, বর্গ যে বয়সে ফিরতে চাইছেন, অনেক খেলোয়াড় তার চেয়েও বেশি বয়সে এখনও খেলা চালিয়ে যাচ্ছেন। সাম্প্রতিকতম উদাহরণ জিমি কোনর্স। এখনও টেনিস সার্কিটে তিনি বেশ সম্ভ্রম-জাগানো নাম। কিন্তু বর্গের কথা আলাদা। একবার টেনিস ছাড়ার পর বর্গ গত আট বছরে তেমনভাবে টেনিস র‍্যাকেট ছুঁয়েও দেখেননি। তাই এতদিন বিচ্ছিন্ন থাকার পর ফিরে আসা সোজা কথা নয়।

বর্গের ঘনিষ্ঠ বন্ধু আমেরিকার ভিটাস গেরুলাইটিস মনে করেন, "বর্গ নিজে যদি ওর সক্ষমতা বিষয়ে একশো ভাগ নিশ্চিত না হয়, তা হলে কোর্টে পা দেবে না। সে নিজের ব্যাপারে দারুণ সচেতন। আর এখন

সম্প্রতি বর্গ জানিয়েছেন, "আমি যখন ভালই খেলতে পারছি, তখন কেন শুধু-শুধু প্রদর্শনী ম্যাচে অংশ নিতে যাব, আমি প্রথম শ্রেণীর টুর্নামেন্টগুলোয় অংশ নিতে চাই।"

পুরোপুরি 'ফিট' হয়ে আন্তর্জাতিক মানের খেলোয়াড়দের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার ক্ষমতা ওর আছে বলে আমি মনে করি না।" গেরুলাইটিস নিজে ছ' বছর আগে টেনিস ছেড়েছেন, এখন তিনি আমেরিকার টেলিভিশন সংস্থা সি· বি· এস·-এর টেনিস বিশেষজ্ঞ। তিনি আরও বলেন, "বর্গ কেন যে এভাবে ফিরতে চাইছে তা আমি জানি না। কথাও হয়নি। আর বর্গ তো ওর ব্যবসা নিয়ে ব্যস্ত। কয়েকদিনের প্র্যাকটিসে বাজিমাত করা তার মতো প্রতিভাবান খেলোয়াড়ের পক্ষেও অসম্ভব, এটা কেন সে বুঝতে পারছে না ?"

গেরুলাইটিস অবশ্য মনে করেন, বর্গ চেষ্টা করলে এখনও সার্কিটের অনেক তরুণকেই পর্যুদস্ত করতে পারেন। তবে বরিস বেকারের মতো প্রথম কয়েকজনের সঙ্গে মোকাবিলা করা সতিই শক্ত।

সুইডিশ টেনিস ফেডারেশনের এক কর্মকর্তা রল্‌ফ লেভিন-এর মতে, এতদিন বর্গ টেনিস জগতের বাইরে ছিলেন বলে তাঁর পক্ষে প্রথম কুড়িজনের মধ্যে আসা আর সম্ভবই নয়। তবে প্রদর্শনী ম্যাচে তিনি অবশ্যই ভাল ফল করতে পারেন।

টেনিসের আরও কয়েকজন বিশেষজ্ঞরই এই মত। প্রতিভাবান বর্গ তাঁর শীতল কঠিন মানসিকতা দিয়ে শক্ত অনেক ম্যাচ জিতে নিয়েছেন ঠিকই, এখনও সেই মানসিকতাও হয়তো আছে, কিন্তু জেতার জন্য শুধু প্রতিভা বা মানসিকতা থাকলেই হয় না, চাই দারুণ শারীরিক সক্ষমতা। নিঃসন্দেহে বর্গ এটাতেই অনেক পিছিয়ে পড়বেন। কয়েক মাস টেনিসের বাইরে থাকলে যেখানে ফিরে এসে জায়গা পাওয়া মুশকিল, সেখানে আটটা বছর নিঃসন্দেহে বড় দীর্ঘ সময়। বিয়র্ন বর্গ প্রতিযোগিতায় ফিরে এলে টেনিসের আকর্ষণ নিঃসন্দেহে বাড়বে। কিন্তু আগের মতো একের পর এক টুর্নামেন্ট জিততে পারবেন কি না সন্দেহ।

খেলাধুলো

শিবাজি গঙ্গোপাধ্যায়

উচি মাওয়াসি গেরি

আমি গত কয়েকটি সংখ্যায় কিওকুশিন ক্যারাটের পা দিয়ে মারার বিভিন্ন পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করেছি। ক্যারাটেতে পা দিয়ে মারার বা মার আটকানোর কৌশল বা পদ্ধতিগুলো বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। শরীরের বিভিন্ন অংশে আঘাত করার জন্য যেমন দরকার কোথাও বা হাতের প্রয়োগ, কোথাও বা পায়ের প্রয়োগ, কোথাও বা মাথার প্রয়োগ, তেমনই প্রতিপক্ষের মার আটকানোর জন্য দরকারমতো শরীরের এইসব অঙ্গ ছাড়াও অন্যান্য অঙ্গের ব্যবহার করা যায়। প্রতিপক্ষের বিভিন্ন আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য কখনও হাতের প্রয়োগ কখনও বা পায়ের প্রয়োগ দরকার। অবস্থান অনুযায়ী প্রতিপক্ষের শরীরের দুর্বল স্থানে আঘাত হানার জন্য যেখানে দরকার সেখানে হাতের প্রয়োগ, যেখানে দরকার সেখানে পায়ের প্রয়োগ ঠিকভাবে জানা দরকার। যেখানে আঘাত করার জন্য পায়ের প্রয়োগ দরকারি সেখানে হাতের প্রয়োগ করতে যাওয়া ঠিক নয়। তাতে নিজের যথেষ্ট অসুবিধে হতে পারে এবং প্রতিপক্ষকে কাবু করা মুশকিল। এইবার আমি আর একরকম পা দিয়ে আঘাত করার পদ্ধতি 'উচি মাওয়াসি গেরি' নিয়ে আলোচনা করব।

উচি মাওয়াসি গেরি : এই কথাটার মানে হল 'ইন্‌সাইড টু আউটসাইড রাউন্ড হাউস কিক', বাংলায় বলা যেতে পারে ভেতর থেকে বাইরের দিকে ঘুরিয়ে পা দিয়ে মারার পদ্ধতি।

আগের মতো প্রথমে ইওইদাচিতে ঠিকভাবে দাঁড়াতে হবে এবং হাত মুঠো করে কানের উচ্চতায় হাত দুটো মুখের সামনে রাখতে হবে। এইবার প্রথমে ডান পা দিয়ে অনুশীলন করতে হবে। ডান পায়ে শুরু করার আগে শরীরের ওপরভাগ মোটামুটিভাবে ৪৫ ডিগ্রি বাঁ দিকে ঘুরিয়ে নিতে হবে। ডান পায়ের পাতার বাইরের অংশ টানটান করে বাইরের দিকে রাখতে হবে। এইবার ডান পায়ের হাঁটু সোজা রেখে ডান পায়ের পাতার বাইরের অংশ বাইরের দিকে টান করে রেখে সামনের দিক দিয়ে মুখের উচ্চতায় ঘুরিয়ে বৃত্তাকারে নীচে নামিয়ে নিয়ে মাটিতে এনে রাখতে হবে। ডান পা মাটিতে একেবারে আস্তে এসে স্পর্শ করা উচিত। ডান পা দিয়ে মারার সময় ডান হাত নীচে নেমে আসতে পারে বা মুখের কাছেও থাকতে পারে। ডান পা দিয়ে মারার সময় বাঁ পায়ের ওপর শরীরের সম্পূর্ণ ওজন রাখতে হবে। সেইসঙ্গে বাঁ পা হাঁটু থেকে একটু মুড়ে বাঁ পা মাটিতে শক্ত করে ধরে রাখতে হবে। এইবার ডান পা দিয়ে মারা হয়ে গেলে সব ব্যাপারগুলো একইভাবে খেয়াল রেখে বাঁ পায়ে অনুশীলন করতে হবে। তারপর আবার ডান তারপর বাঁ—এইভাবে প্রতি পায়ে ১০—১৫ বার, তারপর আস্তে-আস্তে বাড়িয়ে প্রতি পায়ে ২৫—৩০ বার অনুশীলন করতে হবে। পা যখন সামনের দিকে ঘুরতে শুরু করবে পায়ের আঙুলের অংশ ওপর দিকে রেখে পায়ের বাইরের অংশ এবং পায়ের পাতার অবস্থান মাটি থেকে উলম্বভাবে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত থাকবে। খেয়াল রাখতে হবে যেন পা ঘুরিয়ে মারার সময় হাঁটু মুড়ে না যায়।

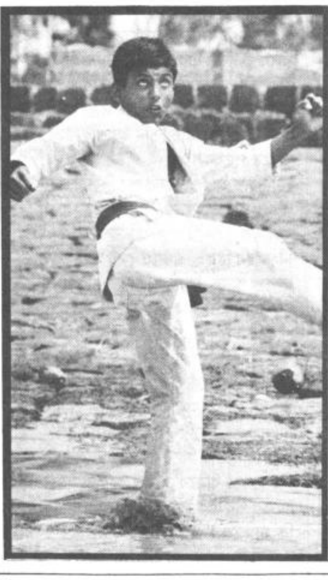

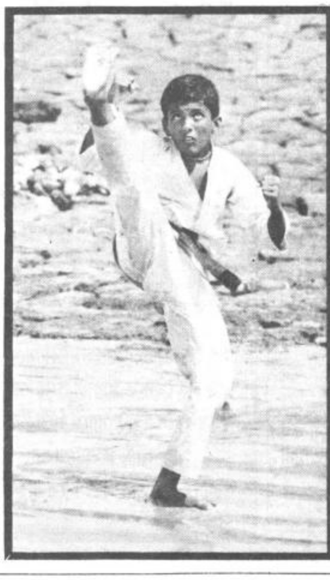

ফোটো : উৎপল সরকার

কাহিনীর পরবর্তী অংশ ...
তখন ...
রয় !
ব্ল্যাকি সুন্দর ছুটেছে ! গ্লেন রিচি বাঁ দিকে ফাঁকায় দাঁড়িয়ে ...
কিন্তু রয় নিজের জন্য জায়গা করে নিচ্ছিল এবং ...
ব্ল্যাকি, আমাকে দিয়ে দাও !
দেওয়াল পাস...
... এবং 'রকেট' !
গো-ও-ও-ও-ল !
মেলচেস্টার রোভার্স ১, ওয়ালফোর্ড রোভার্স ০ !
রোভার্সের রয়
রয়, ওটা !
ভুলে যাও ! নিজেদের পিঠ চাপড়ে সময় নষ্ট না করলে আর একটা গোল করা যাবে !
ইয়ে... তা ঠিক বস ! তুমি যা বলবে ...
মুহূর্ত পরে, পাকো ডায়াজ চমৎকারভাবে ছুটে গিয়ে বাঁক খাওয়া ক্রস দিলে ...
বলটা ও বেশি পেছনে টেনেছে !
ঘুরবার চেষ্টা করলেই রয়কে ওরা চেপে ধরবে ...
ওহ্হ্হ্হ ! বল জালে !
কী দুর্দান্ত গোল !
ঘোরার কথা কে বলছিল ?

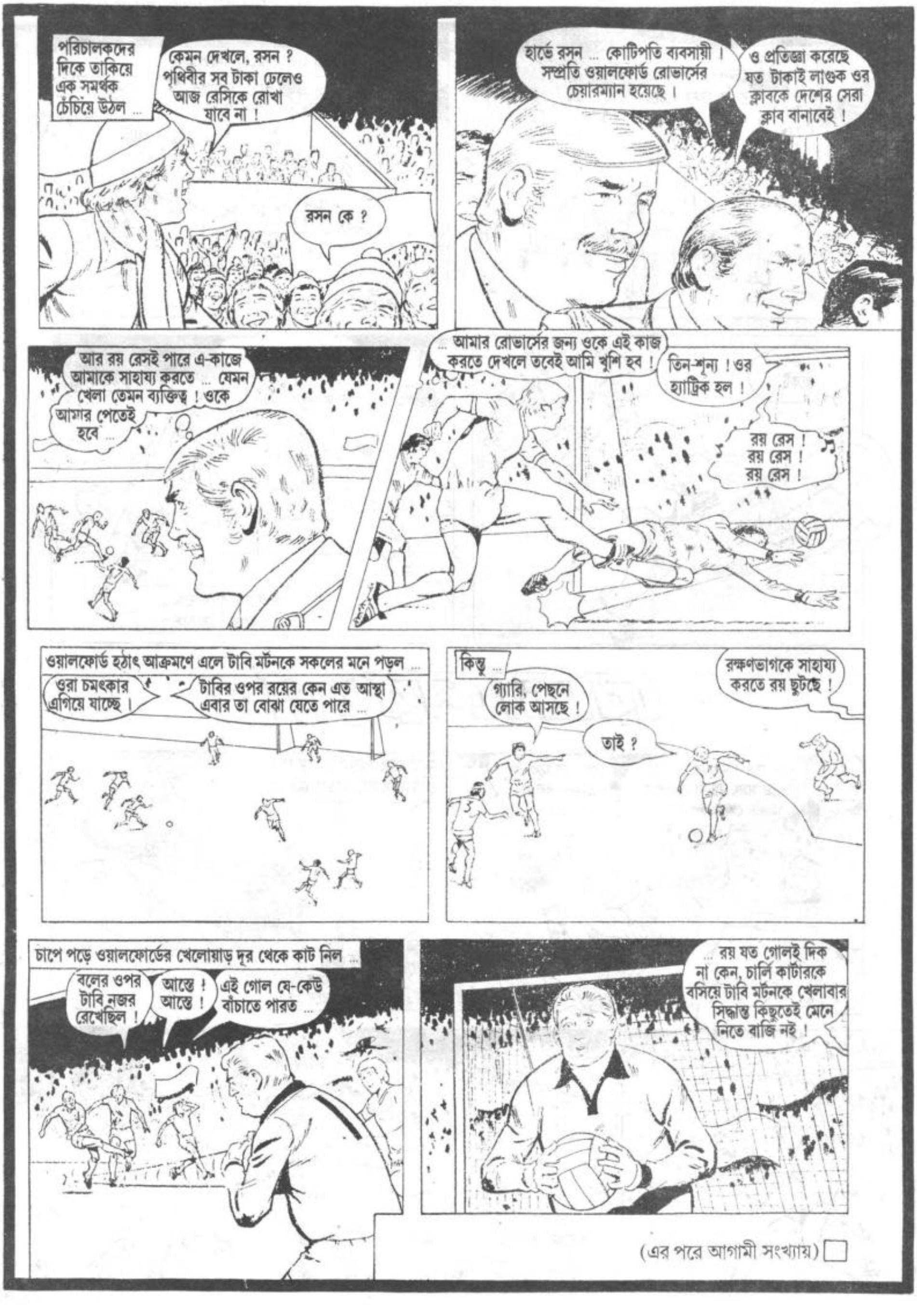

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

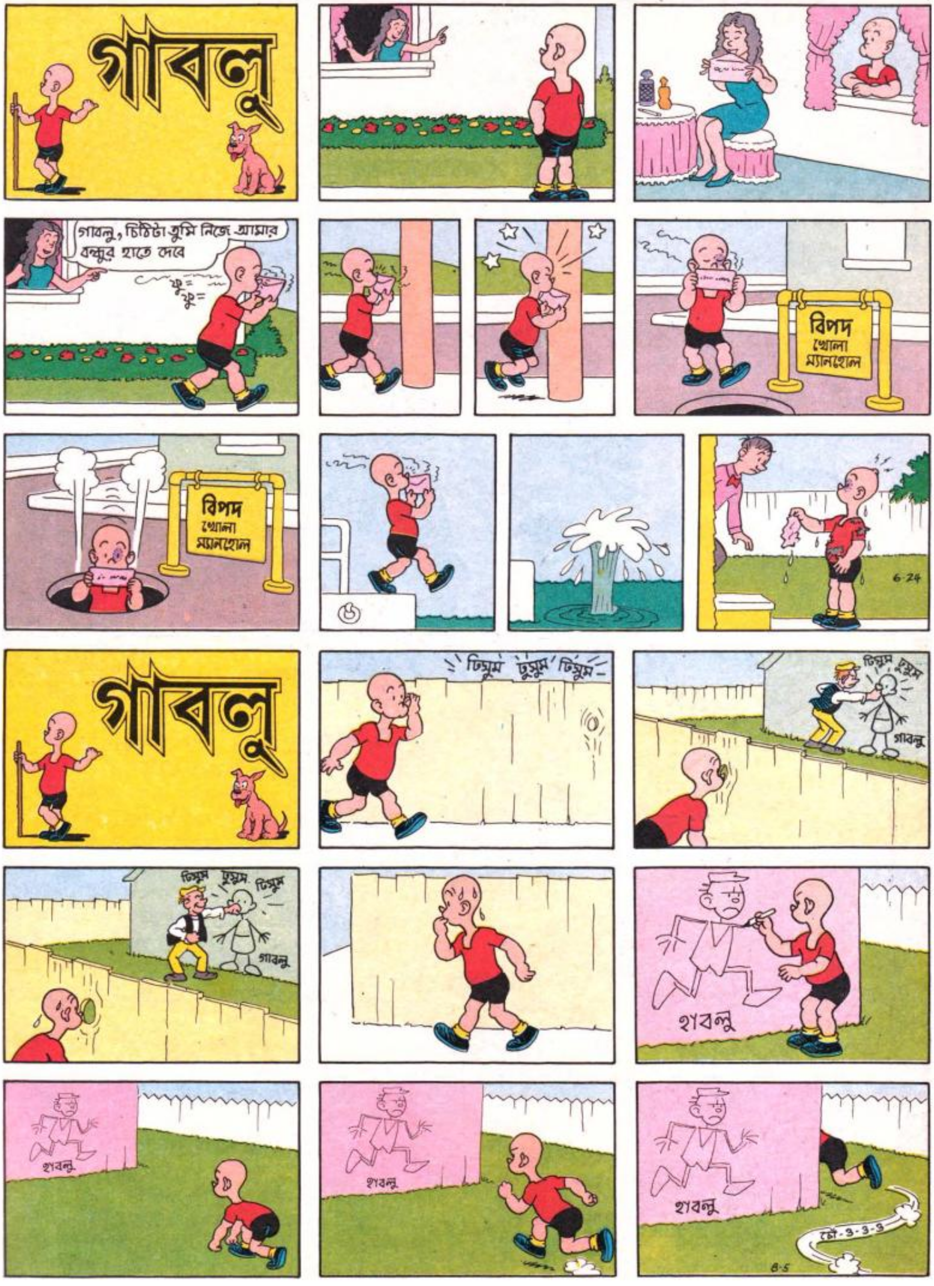
গাবলু
গাবলু, চিঠিটা তুমি নিজে আমার বন্ধুর হাতে দেবে
ফু ফু
বিপদ খোলা ম্যানহোল
বিপদ খোলা ম্যানহোল
6-24
গাবলু
ঢিসুম ঢুসুম ঢিসুম
ঢিসুম ঢুসুম
গাবলু
ঢিসুম ঢুসুম ঢিসুম
গাবলু
হাবলু
হাবলু
হাবলু
হাবলু
ভোঁ-ও-ও-ও
8-5

সম্পূর্ণ উপন্যাস

খোঁজো

লীলা মজুমদার

আজকাল ভিটুদের পাড়ায় একটা সন্দেহজনক লোককে প্রায়ই দেখা যায়। খুব তাড়াতাড়ি হাঁটাচলা করে। গলিঘুঁজিতে ঢোকে, ল্যাম্পপোস্টের তলায় দাঁড়ায়। মাসি একদিন তাকে দেখে বলল, "আমার অমন চেহারা হলে সারাক্ষণ ঘোমটা দিয়ে থাকতাম।" এমনই নিষ্ঠুর ভিটুর ছোটমাসি। লোকটার ডান চোখটা কিছুতে বোধ হয় খুবলে খেয়েছে, তাই গোলাপি রঙের একটা তাপ্পি মারা। হয়তো তাই ডান দিক থেকে কোনও যানবাহন হঠাৎ একদিন ওকে চাপা না দিলেও ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছিল। তাতেই একটা ঠ্যাঙে খুব চোট লেগে থাকবে। লাঠি নিয়ে নেংচে হাঁটতে হয়। লোকটার জীবনটা নিশ্চয় খুব রোমাঞ্চকর ঘটনায় ঠাসা। ভেবেও ভিটুর মন আনচান করে। ইস, ওর পেছনে হয়তো শত্রুদের চর লেগেছে। ভাবলেও দিব্যি একটা শিহরন লেগে যায়।

ওরা দক্ষিণ কলকাতার একটা তিনতলা বাড়ির দোতলার পুব-দক্ষিণ দিকটাতে থাকে। ছোটমাসি বলে ওটাই নাকি বাড়ির সবচাইতে ভাল আর দামি ফ্ল্যাট। পাড়ার লোকের তাই নাকি চোখ টাটায়। অথচ ভিটু বেশ ক'বার রাস্তায় নেমে গিয়ে চারদিকে তাকিয়ে দেখেছে, কারও চোখে কিচ্ছু হয়েছে বলে মনে হয়নি। বড্ড বাজে বকে ছোটমাসি। কিন্তু শুনতে বেশ লাগে।

ভিটুদের ফ্ল্যাটের রাস্তার দিকের কোনাটা জুড়ে খাসা একটা বারান্দা আছে। তিনতলায়ও ওইরকম আছে। ওপরের ওরা সেখানে খুদে গাছের বাগান করেছে। কী সব ওষুধপত্র আর ছাঁটাই করে, এই আধ হাত মাপের পেয়ারা গাছে সত্যিকার পেয়ারা ফলাচ্ছে। সবাই

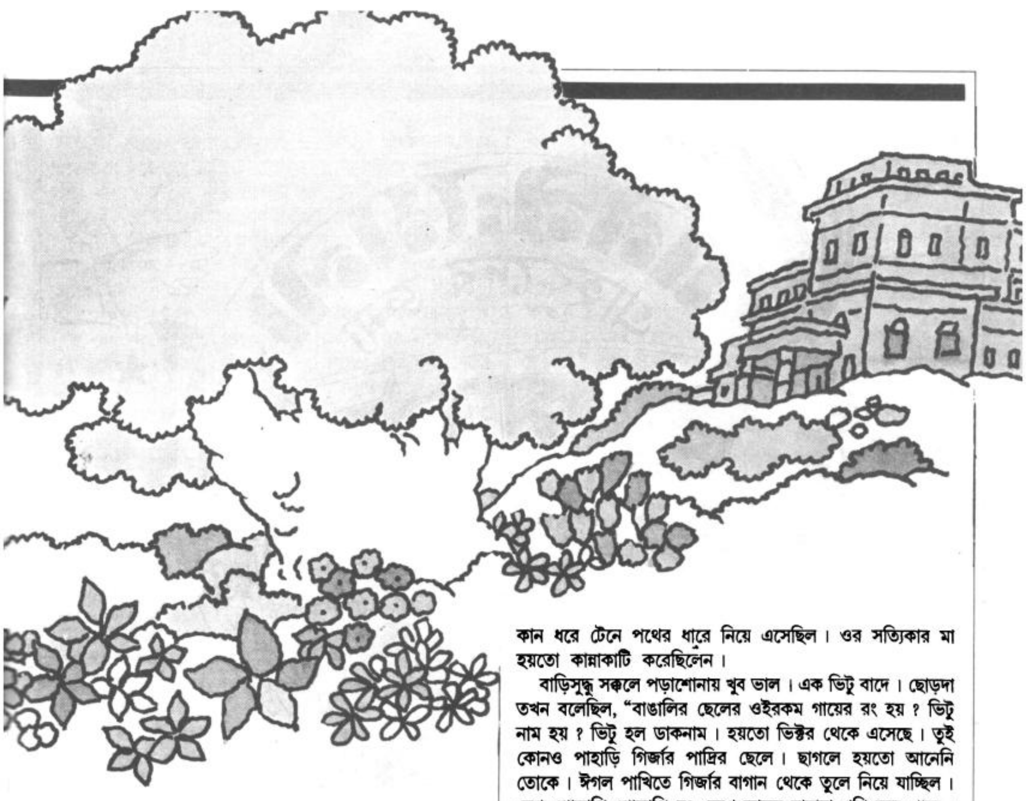

খুব ভাল বলে। কিন্তু ভিটুর কষ্ট লাগে। ওকে যদি কেউ একটা কলসিতে পুরে রাখত, বাড়তে দিত না, তা হলে ওর কেমন লাগত? বড়রা বড্ড নিষ্ঠুর হয়।

ভিটুর বয়স ১২ বছর পুরে গেছে। নিজের চেহারা নিয়ে ভিটু ভারী লজ্জা পায়। বাড়ির কারও মতো দেখতে নয় ও। না মা, না বাবা, না কাকা, না দাদারা। ওদের দিব্যি গাঁট্টাগোট্টা, কালোকোলো চেহারা, মাথাভরা কুচকুচে কালো কোঁকড়া চুল। ভিটু অন্যরকম। পাতলা, ফরসা, ছাই রঙের চোখ, একটু লালচে ঢেউখেলানো চুল।

ওকে দেখে অনেকে অনেক কথা বলে। ও যখন ছোট ছিল, ছোড়দা তো সর্বদা বলত ভিটু ওদের নিজের ভাই নয়। নাকি কোথায় পাহাড়ে বেড়াতে গিয়ে মা ওকে কুড়িয়ে পেয়েছিলেন। পথের ধারে পড়ে ছিল। একটা রামছাগল নাকি বাঁশপাতা মনে করে ওর কান চিবোচ্ছিল। তার দাগ নাকি এখনও স্পষ্ট দেখা যায়। কানটা আর-একটু লম্বা হলে টেনে সামনে এনে ওর চোখে আঙুল দিয়ে দাগ দেখিয়ে দিত। ভীষণ বাজে বকে ছোড়দা। চোখে আঙুল দিলে জল পড়ে, ব্যথা লাগে, কিচ্ছু দেখা যায় না। মা ওর মা নন শুনে ৬ বছরের ভিটুর চোখে জল এসেছিল। মা সব শুনে আচ্ছা করে ছোড়দার কান পেঁচিয়ে দিয়েছিলেন। সেই থেকে আর কিছু বলেনি ছোড়দা। ভিটুর কিন্তু কথাটা মনে ছিল।

আজকাল ওর মনে হয়, হয়তো কথাটা সত্যি। মনখারাপ লাগে। কে জানে কাদের ছেলে ও। হয়তো তেল মাখিয়ে পিঁড়িতে করে রোদে শুকোতে দিয়েছিল আর রামছাগলটা ওকে বাঁশপাতা ভেবে কান ধরে টেনে পথের ধারে নিয়ে এসেছিল। ওর সত্যিকার মা হয়তো কান্নাকাটি করেছিলেন।

বাড়িসুদ্ধু সক্কলে পড়াশোনায় খুব ভাল। এক ভিটু বাদে। ছোড়দা তখন বলেছিল, "বাঙালির ছেলের ওইরকম গায়ের রং হয়? ভিটু নাম হয়? ভিটু হল ডাকনাম। হয়তো ভিক্টর থেকে এসেছে। তুই কোনও পাহাড়ি গির্জার পাদ্রির ছেলে। ছাগলে হয়তো আনেনি তোকে। ঈগল পাখিতে গির্জার বাগান থেকে তুলে নিয়ে যাচ্ছিল। বেশ গোলাপি-গোলাপি রং দেখে ভাবল ছানারা খুশি হয়ে খাবে। নিশ্চয় নখে ব্যথা হয়ে গিয়েছিল, তাই একটু নামিয়ে রেখেছিল। এমন সময় প্রকাণ্ড শিং-ওলা ওই পাহাড়ি রামছাগল ওকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল।"

তখন এই কথা শুনে ভিটু যেমনই অবাক তেমনই রাগত। সে বলেছিল, "তো-তো-তো—"

ছোড়দা বাধা দিয়ে বলেছিল, "ওই দ্যাখ, চটে গেলে মুখ দিয়ে সহজে বাংলা বেরোতে চায় না। তিব্বতি সায়েব তো। বাংলা এখনও সড়গড় হয়নি।"

কয়েকদিন আগেও ওই ছোড়দাই বলেছিল, "তুই বাঙালি তো অঙ্ক কষতে পারিস না কেন? ছবি আঁকাতে প্রাইজ পাস আর প্রাথমিক বিজ্ঞানে ফেল করিস! ছি ছি! ছবি আঁকে খোকাখুকুরা। মেয়েরা আলপনা দিয়ে নকশা করে। তুই ওই যে শোওয়ার ঘরের দেওয়ালে হরিণের সারি এঁকেছিলি, ওইরকম করে চলে নাকি হরিণরা? নিরিবিলি বনের মধ্যে ঘাসজমিতে চরে বেড়ায় আর বাঘে ধরে খায়। পালাতেও জানে না। তোর হরিণরা এক-একটা এক-একরকম হুড়মুড় করে একদিকে পালাচ্ছে যেন। চোখ ঠিকরে বেরোচ্ছে। করে ওরকম হরিণরা কখনও?"

ভিটু বলেছিল, "করে, করে, বাঘে তাড়া করলেই সব ক'টা একদিকে এলোপাথাড়ি ছোটে। প্রাণের ভয়ে বুদ্ধি হারায়।"

ছোড়দা শুনে অবাক! "তুই অত জানলি কী করে? কে তোকে এত জ্ঞান দিয়েছে শিগ্‌গির বল। নয়তো বাবাকে বলে দেব।" ভিটু বলেছিল, "দিয়ো।"

এক বৎসর

২৬ সংখ্যার জন্য ১৮২ টাকার বদলে
এখন দিতে হবে মাত্র ১৫৫ টাকা

দুই বৎসর

৫২ সংখ্যার জন্য ৩৬৪ টাকার বদলে
এখন দিতে হবে মাত্র ৩০০ টাকা

বিদেশের গ্রাহক

বার্ষিক ২৬ সংখ্যার জন্য
৩৬ ডলার অথবা ২২ পাউন্ড

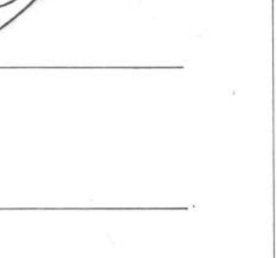

আপনি যদি গ্রাহক হতে চান তাহলে অনুগ্রহ করে আপনার নাম ও সম্পূর্ণ ঠিকানা অবিলম্বে আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের অনুকূলে চেক অথবা ড্রাফ্‌ট সহ নীচের ঠিকানায় পাঠান :

সারকুলেশন ম্যানেজার (ইউ)
আনন্দ বাজার পত্রিকা লিঃ
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট কলিকাতা-৭০০ ০০১

কলিকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে প্রযোজ্য নয়

CLARION C-ABAMD-1

আগে এইরকম করত ছোড়দা। ভিটু নালিশ করত না। বরং শুনে-শুনে মনে-মনে নিশ্চিত হয়েছিল যে, কথাটাতে অনেকখানি সত্যি আছে। বড়দের কথা ছোড়দা কান পেতে শোনে আর বলে ওতে বই-পড়া জ্ঞানের ফাঁকফোকর ভরাট হয়। জ্ঞানের বনেদ শক্ত হয়। তবে চুপিসারে শুনতে হয়। কারণ বড়রা চায় না যে ছোটরাও ওদের সমান জেনে ফেলুক। এ-কথা ভিটুও খুব ভাল করেই জানে। অনেক সময় দেখেছে।

অনেক সময় ভাবে, পালিয়ে যাবে। নিজের সত্যিকার মা-বাবাকে খুঁজে বের করবে। যদি সত্যিই ঈগল পাখিতে নিয়ে এসে থাকে, তাঁদের নিশ্চয় খুব কষ্ট হয়েছিল। কিংবা হয়তো তাঁরা খুব গরিব। ছেলেটা বিদায় হওয়াতে সুবিধেই হয়েছিল। অন্তত বাবার হয়েছিল ; মা'রা অন্যরকম হন। এই মা হয়তো ওর নিজের মাও নন, ওঁর তো অন্য ছেলেও আছে, কিন্তু ভিটুকে কেউ কিছু বললে সইতে পারেন না। ওই ছোড়দারই কান ধরে টেনে এত লম্বা করে দেন। ভিটু অন্য মায়ের খোঁজে চলে গেছে জানলে এই মায়ের খুব কষ্ট হবে। ভাবলেও কান্না পায়। কিন্তু ১২-১৩ বছরের ছেলেরা তো আর কাঁদে না। সে যাই হোকগে, ছোড়দার একটা কথা স্রেফ বাজে। ওর নাম নাকি জানা গেছে গলায় একটা তবকে ইংরেজি 'ভি' অক্ষর লেখা ছিল, তাই দেখে। ভি মানেই ভিক্টর, তা ছাড়া আর কি ! তিব্বতিই হোক, আর চিনেই হোক, ও অবাঙালি এবং খ্রিস্টান।

ভিটু ওদের শোওয়ার ঘরের অন্য দেওয়ালে রঙিন খড়ি দিয়ে আঁকল পেছনে সোনালি বরফের পাহাড় ; তার সামনে সবুজ পাহাড় ; তার গায়ে লাল ছাদ, নীল দেওয়াল, একটা গির্জা ; গির্জার সামনে একটা খালি পিঁড়ি পাতা ; আকাশে একটা হিংস্র চেহারার ঈগল পাখি একটা হলদে রঙের ছোট্ট ছেলেকে নখে করে তুলে নিয়ে উড়ে যাচ্ছে আর মেটে রঙের জমির ওপর লম্বা চুল, হলুদ রঙের গা, জোব্বাপরা একজন মা বুক চাপড়ে হাপুস চোখে কাঁদছেন আর ছাই রঙের চোখ থেকে নীল রঙের জলের ফোঁটা গড়িয়ে পড়ে নদী হয়ে বয়ে যাচ্ছে।

বাবা একদিন ঘরে এসে ছবিটা দেখে বলে ফেললেন, "বাঃ, বেড়ে ফ্রেস্কোর মতো দেখতে লাগছে তো !"

তারপর আগে আঁকা সাদা-কালো হরিণের ছবির দিকে তাকিয়ে রইলেন। একটুও বকলেন না। শেষটা বললেন, "বারোর ক্লাসটা তো উতরোতে হবে। নইলে আর্ট কলেজে নেবে না। তবে সারাজীবন খেতে পাবিনে, তার জন্য তৈরি থাকিস।" এই বলে হঠাৎ ওর পিঠটা একটু চাপড়ে দিয়ে চলে গেলেন।

কিচ্ছু বলেনি ভিটু। ঘর থেকে বেরিয়ে বড় বারান্দাতে গিয়ে অনেকক্ষণ পথের দিকে তাকিয়ে কিচ্ছু-না-র দিকে তাকিয়ে ছিল। ছোড়দার মাধ্যমিক পরীক্ষা হয়ে গিয়েছিল। সে ভুবনেশ্বরে মামার বাড়িতে মাসখানেকের জন্য বেড়াতে গিয়েছিল। ওরা দল বেঁধে ওদিকটা সফর করবে। ওকে বলেছিল, "আমি না গিয়ে, তুই গেলে কাজে দিত। কতরকম ফ্রেস্কো দেখতিস।"

যেতে কি আর ইচ্ছে করে না ? খুব করে। সে তো বিষ্টুপুরের, বীরভূমের পোড়ামাটির ফ্রেস্কোও দেখতে ইচ্ছে করে। সুবিধে হচ্ছে কই ? আরও তিন বছর স্কুল করতে হবে। ওইসব অঙ্কটঙ্ক কষতে হবে। অথচ যোগ-বিয়োগ গুণ-ভাগ আর একটা ফুটকি নিয়ে তো কথা। খালি ওই ফুটকিটা কোথায় বসাবে সেইটে সব সময় মালুম দেয় না।

ঠিক এই সময় এক চোখে গোলাপি তাপ্পি দেওয়া খোঁড়া লোকটা অন্য চোখ দিয়ে ভিটুর দিকে তাকিয়ে, একটু মুণ্ডু নাড়ল। ভিটু বুঝল, ওকে ডাকছে। মনটা নেচে উঠল। কে জানে এইখান থেকেই হয়তো একটা দুরন্ত অভিযানের শুরু হবে। এই মুহূর্তেই। এ-কথা ভেবেও ভিটুর হাসি পাচ্ছিল যে, লোকে মনে করে যারা ছবি আঁকে তারা বুঝি ভিতু আর দুর্বল হয়। ভিটু স্কুলে যোগব্যায়াম করে। এক জোড়া মুগুর আর খানিকটে নির্জন জায়গা পেলেই কষে মুগুর ভাঁজত। এ-বাড়ির ছাদটাতে পর্যন্ত মেয়েরা হাওয়া খায়। তাদের টিটকিরি সইতে পারা যায় না। তবু রোজ ভোরে নিজেদের ঘরে ভিটু বুক-ডন করে। ছোড়দা হাসাহাসি করে। তা করুকগে। সে তো ওর ছবি আঁকা নিয়েও হাসাহাসি করে। বলে কাগের ঠ্যাং বগের ঠ্যাং। তা ছাড়া ওই যে বইমেলায় রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবির খুদে বই বিক্রি হচ্ছিল, তাই দেখেও শুধু ছোড়দা নয়, বাড়িসুদ্ধু সবাই হাসাহাসি করেছিল। বলেছিল ওরকম অদ্ভুত শেপের মানুষও হয় না আর ওইসব বিটকেল জানোয়ারও হয় না। শুনে ভিটু অবাক ! হয় না আবার কেমন কথা ? ওই তো দিব্যি হয়েছে। মাটির পৃথিবীতে চরে বেড়ায় না বলেই হয় না ? কী আর বলবে !

এই সময় একচোখো লোকটা ওকে আঙুল বেঁকিয়ে ডাকল। ও স্পষ্ট দেখতে পেল। অন্য লোকদের মতো হাতছানি দিয়ে নয়। বাঁ হাতের বকবার আঙুলটা বেঁকিয়ে ডাকল। কিন্তু ভিটু যখন পেছনের ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে নেমে, বাড়ির পাশের গলির মাথায় ছোট ফটক দিয়ে বাইরে এল, তাকে আর দেখতে পেল না। তবে কি ওকে ভিটু ভুল বুঝেছিল ? ভিটুর সঙ্গে ওর কী ? একটা কটা চুল, হলদেটে গায়ের রং ছোকরা ওর কোন কাজটাতে লাগতে পারে ?

অবশ্য এমনও হতে পারে, বাড়ির সামনে সে দেখা করতে চায়নি। এ-বাড়িতে থাকে বলেই যে তারা বিশ্বাসযোগ্য, তাই বা কী করে সে জানবে। তা ছাড়া বিশ্বাসযোগ্য কিনা, সে-বিষয়ে ভিটুরও যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তিনতলার সেনগুপ্তরা অবশ্য চেনা লোক। ওই মোটা ভদ্রলোক কাকার সঙ্গে একই কলেজে প্রোফেসারি করেন। একসঙ্গে বরাবর পড়াশোনা করেছেন। এক যদি পরে কুসঙ্গে পড়ে বিগড়ে গিয়ে থাকেন। বুড়ো বলে কি আর কুসঙ্গে পড়তে পারেন না ? যারা জেলে যায় তারা কি সব খোকা ?

একতলার লোকরাও যথেষ্ট সন্দেহজনক। ব্যবসা করে নাকি বড়লোক হয়েছেন। কে জানে রে বাবা কিসের ব্যবসা। কারও সঙ্গে মেশেন না। সাহেব-সাহেব ভাব। কুচকুচে কালো রং। সারাক্ষণ ইংরেজি বলেন। নাম নাকি চ্যাউড্রি। মেয়েরা কখনও শাড়ি পরে না। সর্বদা শালওয়ার কামিজ কিংবা প্যান্টেলুন পরা। চুল ছাঁটা। ওদের কয়েকটা ছেলেও আছে। তবে কোনটা ছেলে কোনটা মেয়ে ভিটু সব সময় বুঝতে পারে না। কাকা বলেন ওঁরা নাকি বেজায় অহঙ্কারী। ভেবে দ্যাখ, একে অসৎ তায় অহঙ্কারী।

এসব লোককে এভাবে চরে বেড়াতে দেওয়া উচিত নয়। ভিটুর নাকের ডগায় শাগরেদকে ইশারা করে যাবে আর ভিটু টের পাবে কিন্তু কিছু বলবে না ! তাই কখনও হয়। শরীরটা একটু রোগা-পাতলা মতো হলেও, মনের মধ্যে যে সিংহ গর্জাচ্ছে তা অন্য কেউ টের না পাক, ভিটু নিজে পায়।

ওর দেরাজের অন্য কাপড়ের তলায়, সর্বদা গামছায় বাঁধা একটা পুঁটলি থাকে। তাতে যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিস বাঁধা থাকে ; যাতে দরকার পড়লেই পুঁটলিসহ রওনা দিতে পারে। কারও কাছে হাত পাততে না হয়। একটা আধময়লা রুমালে বাঁধা জন্মদিনে পাওয়া পনেরোটা টাকা আর কিছু খুচরো পয়সাও পুঁটলিতে ছিল।

ঘরে গিয়ে টুপ করে পুঁটলিটা বগলে পুরে, গলিপথ দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে আসতে ভিটুর তিন মিনিটের বেশি লাগেনি। লোকটা হনহন

করে হেঁটে ততক্ষণে অনেকটা পথ এগিয়ে গেছে।

বেহালার এ-অঞ্চলটা গঙ্গার ধার থেকে খুব বেশি দূরে নয়। উত্তর দিকে শহরটা যেমন হুড়মুড় করে গঙ্গার পাড়ি ভেঙে জলে পড়ে আর কি, এখানে তেমন নয়। নদীর ধারে গাছের সারি, সেখান থেকে জমিটা ঢালু হয়ে জল অবধি নেমে গেছে। জলের কিনারায় সারি-সারি ছোট-বড় নৌকো বাঁধা। কোনওটাতে যাত্রী যায়; কোনওটা মাছ ধরার; কয়েকটার আবার তলা চ্যাপটা, তারা মাল বয়। খানিকটা তফাত থেকে একটা বড় ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে ভিটু দেখল কানাখোঁড়া লোকটা হাতের লাঠির একটু সাহায্য নিয়ে তরতর করে পাড়ি বেয়ে একটা মালবাহী নৌকোতে উঠে পড়ল।

॥ ২ ॥

সত্যি কথা বলতে কি, ঝোঁকের বশে এতদূর এসে, একটু দোমনা করেছিল ভিটুর। সে শুধু মায়ের জন্য। তারপরেই মনে হল যার দুটো-দুটো মা, তার ওসব দুর্বলতা শোভা পায় না। ছোড়দাটা দিনে-দিনে যেমন হয়ে উঠছে, ওকে সামলাতেই মায়ের দিন কাটবে। কিছুদিন পরে হয়তো ভিটুকে ভুলেও যাবে। এই কথা মনে হতে, আর-একটু হলে ফিরেই যাচ্ছিল ভিটু।

ভাগ্যিস সঙ্গে-সঙ্গে এও মনে হল, বাড়িসুদ্ধু সব্বাই পড়াশোনায় ভাল। গণিতশাস্ত্রবিদ, অধ্যাপক, বৈজ্ঞানিক। ভাবুকদের নিয়ে এরা হাসিঠাট্টা করে। কাকা একটা ছড়াও বেঁধেছিলেন। ভুলভাল ছন্দ। ভাল করে মনেও নেই। কী যেন ভাবুক, পৃষ্ঠে-লাগা চাবুক! এইসব খেলো কথা। শুনলে গা জ্বলে যায়। ছবি আঁকা হল আঁচড়-কাটা। মূর্তি গড়া হল পুতুলখেলা। কবিতা হল সোজা কথা বাঁকিয়ে বলা। তবে যাত্রা দেখতে ভালবাসে। মজার নাটক দেখে-দেখে হেসে গড়ায়। খেলা দেখে। মোহনবাগানের ফ্যান সবাই। চোখ বুজে হাততালি দেয়। উলটো পক্ষ গোল দিলে, চ্যাঁচায়, শেম! শেম! নাঃ, এদের সঙ্গে আর থাকা যায় না। অন্য মা-কে খুঁজে পেলে এখানে এনে দেখিয়ে যাবে। দু'জনেই বোধ হয় খুশি হবেন।

ওই লোকটা যে নৌকোতে উঠে পড়ল, সেটা খুব দুলে উঠল। তার মানে মাল বোঝাই হয়নি। মাল-নৌকোর খোলটাও বড় হয়। বোঝাই হলে নাকি অনেকটা জল সরে যায়। কাকার কাছে ও অঙ্ক কষে আর তাড়া খায়। কাকা বলেছেন, ও একটা ইডিয়ট, ওকে দিয়ে কিচ্ছু হবে না। তবে আইনস্টাইনও নাকি অঙ্ক পারতেন না বলে স্কুল থেকে নাম কেটে দিয়েছিল আর তিনিই এখন একজন অসাধারণ বিজ্ঞানী বলে স্বীকৃত।

কাকা ভেবেছিলেন, এ-কথা শুনে বুঝি ভিটু খুব উৎসাহ পাবে আর বেশি বেশি করে অঙ্ক কষার চেষ্টা করবে। তাই না আরও কিছু। ভিটু ভাবে সেই যে কারা দশের বেশি গুনতে পারে না। কিন্তু তাই দিয়ে দিব্যি চালিয়ে নেয়। দশমিকও তো অনেকটা তাই। সে যাই হোক, বৈজ্ঞানিক কিংবা পণ্ডিত হওয়ার ওর বিন্দুমাত্র ইচ্ছা ছিল না। তার চেয়ে ওই যে সূর্য ডোবার ঠিক আগটাতে সারি বেঁধে বকের মতো পাখিরা উড়ে গঙ্গা পার হয়ে কোথায় যেন চলে যায়, তাদের ওই ওড়াটুকুকে যদি কাগজে, কি দেওয়ালে, কি মাটিতে নামানো যেত, তবেই ওর মন ভাল হয়ে যেত। পাখি নামাতে চায় না ভিটু। আকাশের পাখি আকাশে উড়ুক। খালি ওর ওই ওড়াটুকুকে যদি ধরা যেত, কী ভালই না হত!

মাকে একবার বলেওছিল কথাটা। মা পর্যন্ত কিছুই বোঝেননি। ওর মাথায় হাত বুলিয়ে বলেছিলেন, "তাই কখনও যায় বাবা? উড়ন্ত পাখি থেকে ওড়াটাকে আলাদা করা যায় কখনও?" যায় না হয়তো।

তবু ইচ্ছে করে।

ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে ভিটু ভাবে, যারা মাল বইবার কাজ করে তাদের বেশ ষণ্ডামার্কও হতে হয়। দরকার হলে বোঝা বইবার ক্ষমতা ধরা চাই। কিন্তু যারা চোরাচালানির ব্যবসা করে, কিংবা ছেলেধরার শাগরেদ হয়, তাদের হয়তো গা-ঢাকা দেওয়ার একটা করে নিরাপদ আস্তানা দরকার হয়, যেখানে নদী-পুলিশরা খানাতল্লাশি করলেও কিচ্ছু পাবে না। হয়তো তোলা উনুনে মাঝি-মাল্লাদের ভাত রেঁধে দেয়। জেলেদের কাছে শস্তায় মাছ পাওয়া যায়। তেল-ঝাল দিয়ে তাই রাঁধে।

ওই আর একটা জিনিস! ভিটুর বড্ড তেল-ঝাল দিয়ে রান্না খাওয়ার শখ। কিন্তু লঙ্কার আস্বাদ দূরে থাকুক, গন্ধ পেলেও চোখ দিয়ে জল পড়ে। রান্নায় আদৌ লঙ্কা দেওয়া হয়নি, বরবটির মাথা দেখে ও ভেবেছে বুঝি লঙ্কা, তাতেই জিভ ঝালের চোটে জ্বলতে থাকে। ছোড়দা তাই দেখে বলতে ছাড়ে না, "সাহেবদের ওইরকম হয়।" মা ওর দিকে তাকাতেই একেবারে বোবা! যেন ভাজা মাছটি উলটে খেতে জানে না।

সে যাই হোক, একচোখোর আস্তানাটা তো জানা হল। বাকি আছে ওর সঙ্গী-স্যাঙাতদের ধরা। ভিটু যতই ছবি আঁকুক না কেন, ওর বুদ্ধি আসলে কিছু কম যায় না। ও যদি দুষ্কর্মে জড়িয়ে পড়ত, তা হলে ও-ও একটা নিরাপদ আস্তানা খুঁজে বের করে, সেখানে নিশ্চিন্তে বসবাস করত। তা হলে হাজার তল্লাশি করেও পুলিশও কিছু আইনভঙ্গের সন্ধান পাবে না। এসব ভিটুর জানা আছে। মিছিমিছি ও ছোড়দার কেনা তদন্তের গল্প পড়েনি!

খিদিরপুরের ডক ছাড়িয়ে আরও বেশ খানিকটা দূরে এই জায়গাটা। তবে ভিটুদের বাড়ি থেকে খুব একটা দূরেও নয়। এখানে

ওরা কত সময় ছুটির দিনে বেড়াতে এসেছে। আগে যেখানে ভাঙা ডাঙার মতো ছিল ; অনেক দূরে-দূরে আর-একটা বাগানবাড়ি। বড়লোকরা সেখানে ছুটি কাটাতে আসত। নিজেদের জেনারেটর চালিয়ে ঘর বাগান আলো করত। বড়-বড় ডালকুত্তো রাখত পাহারা দেওয়ার জন্য। এখন সেসব জায়গায় নতুন-নতুন পাড়া গড়ে উঠেছে। কত ফ্ল্যাটবাড়ি উঠেছে। তারই একটাতে ভিটুরা থাকে।

এখানে স্কুল আছে, কলেজ আছে, খেলার মাঠ আছে, পার্ক আছে, আর একটা ছোট রেলের লাইন আছে, তার সুন্দর স্টেশন আছে। সেখান থেকে ট্রেনে চেপে একঘণ্টার মধ্যে বি-বি-ডি বাগের কাছে পৌঁছে যাওয়া যায়। এখানে হাট-বাজার, মার্কেট, সব আছে। হাসপাতাল আছে, সিনেমা হাউস আছে, কী নেই ভিটু ভেবে পায় না। ভিটুর ইচ্ছে করে এখান থেকে দূরে, অনেক দূরে চলে যেতে। ট্রেনে নয়, বাসে নয়, প্লেনে নয়—যদিও ঘাটের কাছের মাঠে ছোট প্লেন নামতে পারে। ভিটু নৌকো করে যাবে। অবশ্য তার মধ্যে এক সময়ে ঘোরাপথে মাকে খুঁজতে যাবে।

ঠিক এই সময় নৌকোটা থেকে কে যেন গেয়ে উঠল, "নদীর জলে জোয়ার-ভাটা কেমনে আসে যায়। আকাশ পারে মালিক আছে, টান দিয়েছে তায়।" সঙ্গে-সঙ্গে একতারা হাতে সুন্দর মতো একটা ঢ্যাঙা মানুষ, ছইয়ের তলা থেকে বেরিয়ে বাইরে পাটাতনের ওপর বসল। লোকটা গলা ছেড়ে গাইতে লাগল, "জল দোলে গো নৌ দোলে, জল করে ছলছল/ কুল প্লাবিয়ে পাড় ছাপিয়ে কোথা যাবি চল।" জোয়ার আসছে, নৌকো দুলছে, লোকটা গাইছে। ছই থেকে খিচুড়ির সুগন্ধ বেরোচ্ছে। ভিটু পাড়ি বেয়ে নেমে এসে ডাক দিল, "ও দাদা, আমাকে তোমাদের নৌকোতে নিয়ে যাবে ? সব কাজ করে দেব।"

ওর হাত ধরে টেনে নৌকোতে তুলে লোকটি বলল, "সঙ্গে পুঁটলি যে ? বাড়ি থেকে পালিয়ে এলে নাকি ?"

ভিটু চমকে উঠল, "তুমি কী করে জানলে ?"

লোকটি হাসল, "কপালে লেখা আছে যে, ছবি আঁকো তুমি। বাড়ির লোকরা ছবিটবি বোঝে না, তাই তোমাকে হেনস্থা করে।"

ভিটু ব্যস্ত হয়ে বলল, "না, না, সেজন্য নয়। ছবি নিয়ে ওরা হাসাহাসি করে, সেজন্য বকে না। বোঝাতে চেষ্টা করে। বলে ছেলেখেলা। বলে আঁচড় কাটা। আচ্ছা, তোমরা তো জলের ওপর থাকো,ঝিরঝির করে বিষ্টি পড়লে মাছগুলোকে লাফাতে দেখেছ ?"

মানুষটি বলল, "বিস্তর দেখেছি। নদীর ধারে হলুদগাঁও, সেইখানে আমাদের বাড়ি। হলুদগাঁয়ের কালোদিঘির নাম শুনে সেকালে চাষিভাইরা কাঁপত। রঘু ডাকাতের বাড়ি ছিল হলুদবনে। তারা সৎভাবে রোজগারপাতি করাকে ঘেন্না করত। ব্যাটাছেলেরা লুটপাট করে সংসার চালাত। গরিবদের কিছু বলত না। কিন্তু গঙ্গাসাগরের তীর্থযাত্রীদের মধ্যে যারা বড়লোক, তাদের মেরেধরে, কালোদিঘির জলে পায়ে পাথর বেঁধে ডুবিয়ে দিত আর টাকাকড়িগুলোকে দুঃখীদের মধ্যে বিলিয়ে দিত। কী হল ? শিউরে উঠলে যে ? গরিবদের দুঃখ দূর করা কি খারাপ কাজ ?"

ভিটু জোর গলায় বলল, "সে-কাজটা ভাল হলেও, খুনখারাবির টাকা ভাল নয়।"

"কেন ? টাকার গায়ে কিছু লেখা থাকে না। সৎ কাজে লাগালে, খুনের টাকার পাপ ধুয়ে যায়। তবে পাপ কাজ সর্বদা পাপ কাজ, এটা ঠিক। এমনকী, কালোদিঘির মাছগুলো পর্যন্ত সইতে না পেরে, এতটুকু বিষ্টির ছাঁট জলে লাগলেই, পাঁচ হাত লাফিয়ে উঠত। এ আমার নিজের চোখে দেখা।"

এই বলে ফোঁস করে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে মানুষটা বলল, "আমি তাদের বংশধর। তাদের রক্ত আমার শিরায়। আমাকে দেখে তোমার ভয় করছে না ? ঘেন্না হচ্ছে না ?"

ভিটু আশ্চর্য হয়ে বলল, "তা করবে কেন ? জানো, কাশীতে আমার এক দিদিমা আছেন, তিনি বলেন, সব রক্তের রং লাল। জাত-জোত, পাপী-পুণ্যবান বলে কিছু নেই। দুঃখ পেলে সকলের চোখ দিয়ে জল পড়ে, হাত কেটে গেলে রক্ত পড়ে, কেউটে কাটলে মরে যায়, ওষুধ করলে বাঁচে। পাপীরাও তাই, সাধুরাও তাই।"

মানুষটি আশ্চর্য হয়ে বলল, "বাঃ, তোমার তো অনেক বুদ্ধি দেখছি। তা বাড়িঘর ছেড়ে চলে যাওয়া হচ্ছে কেন ? তোমার মা-বাবা নেই।"

ভিটু ব্যস্ত হয়ে বলল, "আছে বইকী। হয়তো দুটো-দুটো আছে। যদিও আমাকে বোধ হয় বলা বারণ।"

মানুষটা তো হাঁ। "বারণ, তবু বলেছে ?"

"ছোড়দা একবার বলে ফেলেছিল। তখন আমার ৬ বছর বয়স। মা ওর কান টেনে এই এত লম্বা করে দিয়েছিলেন— না, না, ভয় নেই, ছেড়ে দিলেই আবার কানটা আগের মতো হয়ে গিয়েছিল। সেই থেকে আমাকে কেউ কিছু বলে না। কিন্তু আমি ভুলিনি। তাই আমার সত্যিকার মা-কে খুঁজতে বেরিয়েছি।"

"এ যে রূপকথার গল্পের মতো শোনাচ্ছে। তা এখন কোন দিকে যাওয়া হবে অন্য মা-বাবার খোঁজে ?"

ভিটু বলল, "সন্ধে হয়ে আসছে তবু আমার দিকে তাকিয়ে বলো, আমি কি বাঙালিদের মতো দেখতে ? বাঙালিদের এরকম হলদেটে রং, কটা চোখ, বাঁকা ভুরু হয় কখনও ? ছোড়দা বলেছিল নেপালি লেপচা তিব্বতিরা এরকম হয়। মা আমাকে পাহাড়ি শহরে বেড়াতে

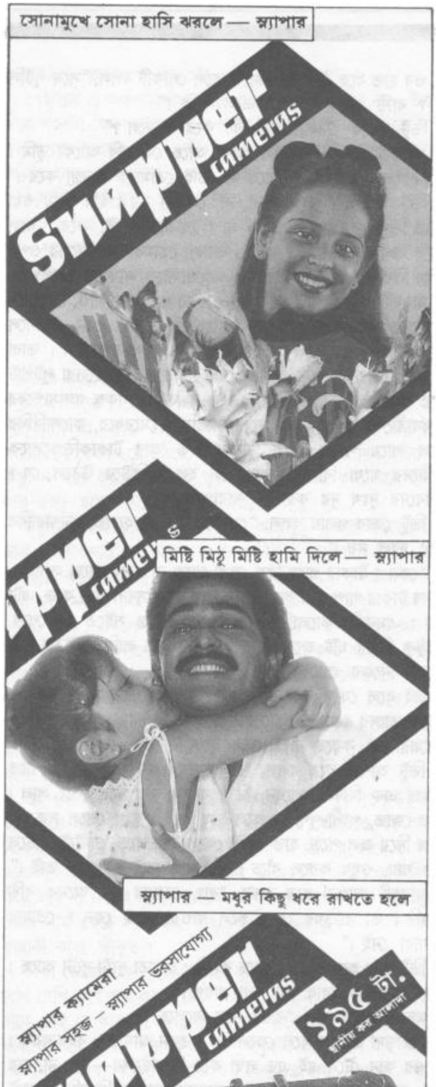

ULKA 13145-BEN

গিয়ে কুড়িয়ে পেয়েছিলেন। ছাগলে খাচ্ছিল— ও কী, আমার দুঃখের কথা শুনে তোমার হাসি পাচ্ছে? তা হলে আমি এক্ষুনি নেমে যাব। যা থাকে কপালে।"

মানুষটি লজ্জা পেয়ে বলল, "ও মা, না, না। তোমার দুঃখে আমি হাসব কেন? আমি কি পাষণ্ড? তবে ছাগলে তো আর মানুষ খায় না।"

"না, খায়নি ঠিক, বাঁশপাতা মনে করে কান চিবিয়েছিল। এখনও নাকি দাঁতের দাগ আছে।"

"এইসব বাজে কথা তোমার ছোড়দা বলেছে? আলবত হয় রাঙালিদের ওইরকম চেহারা। অসমিয়াদের হয়, কোচদের হয়, চিনে, জাপানি, বর্মি—সকলের হয়। তা ছাড়া এ-নদী সরাসরি সাগরে যায়; এখান থেকে পাহাড় অনেক দূরে। এবং সবচাইতে বড় কথা হল, এখন আর নামা সম্ভবও নয়, কারণ আমাদের নৌকো অনেকক্ষণ হল কাছি খুলে ভেসে পড়েছে। তোমার ছোড়দা সম্ভবত গুল দিয়েছে। তোমার খিদে পায়নি? খিচুড়ি তো রেডি। খেয়েদেয়ে আজ রাতে পাটাতনে ঘুমিয়ে থাকো। কালকের কথা কাল হবে। এখন তো তোমার ছুটি, না হয় একটু বিনিপয়সায় নৌ-যাত্রাই করে নিলে। কী বলো? তোমার নাম কী?"

হঠাৎ ভিটুর মনে কেমন একটা ফূর্তি এসে গেল। সে বলল, "অংশুমান রায়।"

॥ ৩ ॥

লোকটি হেসে বলল, "বাঃ, সুন্দর নাম অংশুমান। তাই বলে ডাকে সবাই?"

ভিটু লজ্জা পেয়ে বলল, "না। আমার ডাকনাম ভিটু।"

"ভিটু? ভিটু কেন?"

ভিটু বলল, "ছোড়দা যে বলে আমি কুড়িয়ে পাওয়া ছেলে। পাহাড়ি খ্রিস্টান পাদ্রিদের দেওয়া নাম নাকি ভিক্টর।"

"ভিক্টর থেকে ভিটু তো হতেই পারে।"

"না। মা বলেছেন আমার পিসি আমাকে ডাকতেন বেটু বলে। বেটা থেকে বেটু। বেটু থেকে ভিটু।"

মানুষটি খুশি হয়ে বলল, "বাঃ, বেশ তো গল্পটা। সত্যি গল্প তো?"

ভিটু আশ্চর্য হয়ে গেল। "তুমি সন্ধেবেলা গঙ্গার ওপর নৌকো করে বেড়াও, আবার বলছ সত্যি গল্প কি না! আমার তো মনে হয় সব গল্পই সত্যি। যেটা ঘটেছে শুধু তা-ই সত্যি? যেটা ঘটেনি, কিন্তু যে-কোনওদিন ঘটতে পারে, সেটা সত্যি নয়? এ আমি কিছুতেই বুঝতে পারি না। জানো, আমার বড়দা—সে কলেজে পড়ে আর আমার সঙ্গে কথাই বলে না, আমাকে বলে বালখিল্য মুনি—সে একবার একটু রাত করে সিনেমা দেখে বাড়ি ফিরছিল। শীতকাল, কুয়াশার মতো চারদিকে রাস্তার আলোগুলো ধেবড়ানো লাগছে। হঠাৎ তাকিয়ে যা দেখল, তাতে ওর পিলে চমকে গেল! আবছা আলোতে স্পষ্ট দেখল সামনে-সামনে একটা তালঢ্যাঙা মাথাকাটা মানুষ নিজের মুণ্ডুটা বগলে নিয়ে দিব্যি সুন্দর বড়-বড় পা ফেলে এগিয়ে চলেছে!

"তাই না দেখে বড়দা আর-একটু হলে পড়েই যেত। একটু এগিয়ে গিয়েই বাঁ দিক দিয়ে একটা গলি বেরিয়েছে। ভাগ্যিস তার কাছে পৌঁছে সেই অ-মানুষটা মোড় নিল। সে-জায়গাটাতে কুয়াশা অনেক কম। নইলে বড়দা নির্ঘাত মুচ্ছো যেত। সে মোড় ঘুরতেই আর-একবার তাকিয়ে বড়দা দেখল, আট ফুট লম্বাও নয়, কাটা মুণ্ডু

বগলেও নয়, স্বয়ং ওদের ফুটবল ক্যাপ্টেন বটুদা কমিটি মিটিং শেষ করে ভালমন্দ খেয়ে নতুন ফুটবল বগলে নিয়ে মাথা নিচু করে কুয়াশার মধ্যে দিয়ে বাড়ি ফিরছে ! বড়দা তাই দেখে এমনই নিশ্চিন্ত হল যে, মাথা ঘুরে পড়েই গেল ! এ-কথা তার নিজের মুখে শুনেছি। অসম্ভব জিনিসও সম্ভব হয়। আচ্ছা তোমাকে কী বলে ডাকব ?"

মানুষটি হাসল, "আমার নাম আমেদ। সবাই বলে মামু। কিন্তু অসম্ভব কি আর সত্যি সম্ভব হয় ? তোমার বড়দার দেখার ভুল হয়েছিল। যারা বড়-বড় নৌকো নিয়ে মাঝ-সমুদ্রে যায় তারা কিন্তু সত্যি অসম্ভব জিনিস দেখে ! এমন সব জিনিস, যা কখনওই সম্ভব হতে পারে না। জানো, আমাদের বংশের পুরুষরা কেউ ডাঙায় মরত না। সবাই বড়-বড় নৌকো নিয়ে মাঝসাগরে যেত আর কোথায় কোন ঘূর্ণিঝড়ে পড়ে, সাগরতলে তলিয়ে যেত আর তাদের হদিস পাওয়া যেত না। ডাঙায় কবর নেওয়াকে ওরা ঘেন্না করত।

"শেষটা তাদের মা-বউরা গিয়ে নবাবের কাছে কেঁদে পড়ল, 'আর তো সয় না, বাপজান, তোমার দেহরক্ষী করে, জমিজমা দিয়ে মানুষগুলোকে বসিয়ে দাও। নইলে আমরাও ছেলেপুলে নিয়ে বড় জলে ঝাঁপ দেব।'"

ভিটু বলল, "তখন নবাব কী বলল ?"

"নবাব বলল, 'যারা জন্মে অবধি সাঁতার জানে, তারা ঝাঁপ দিলেও ডোবে না। এই কথা দিলাম, ওদের দেহরক্ষীর কাজ দেব। সমুদ্দুরে যাওয়া বারণ হয়ে যাবে।'

"সেই ইস্তক ওরা আর বড় নৌকো নিয়ে সাগরে যায় না। যখন নবাব গেল, নবাবি গেল, ওরা জাহাজে-জাহাজে সারেং হল, কুক হল, পিরথিমিময় ঘুরে বেড়াতে লাগল। আমাদের বংশে নিরাপদে কাজকাম করে কেউ সুখী হয় না। একটু বিপদের ঝুঁকি না থাকলে, বাঁচব কী করে ! ওই দ্যাখো, দ্যাখো, ওই যে জলে লাইন কেটে ডুব সাঁতার দিয়ে যাচ্ছে, ওটা মানুষখেকো ঘোরেল—গল্প তো অনেক হল। এবার কিছু খাওয়াদাওয়া হোক। ও কী ! তোমার যে ঢুল আসছে। এসো, এসো, ছইয়ের কাছে এসে বোসো। কিন্তু নদীর জলে হাত দিও না, কিছুতে যদি আঙুল কেটে নেয় ! তা ছাড়া ও-জল বড় নোংরা। নালা-নর্দমার ধোয়ানি এসে পড়েছে। তোমরা আবার বলো মা গঙ্গা ভারী পবিত্র ! ডুব দিলে পাপ ধুয়ে যায় !"

অ্যালুমিনিয়ামের ঘড়া থেকে জল ঢেলে হাত ধুয়ে, ওরা পেতলের সান্‌কি নিয়ে খেতে বসল। কী ভাল খাওয়া ! খিচুড়ি আর কুচোমাছ ভাজা আর কাঁচা পেঁয়াজের বড়-বড় টুকরো। তারপর খেজুরগুড়ের খইয়ের মোয়া। কোনও জন্মে এত ভাল খায়নি ভিটু।

নৌকোতে আরও লোক ছিল। মাল বইতে হয় তো। লোকজন তো লাগবেই। খাবার পর তাদের গান শুনতে-শুনতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিল, ভিটু নিজেই জানে না।

রাতে একটু শীত-শীত করেছিল। কে যেন ওর গায়ের ওপর একটা তুলোর কম্বল চাপিয়ে দিল। ভিটু একবার ঘুম জড়ানো স্বরে বলেছিল, 'মা'। তারপরেই আবার ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুম ভাঙল একেবারে সেই সকালে, মুখে যখন রোদ পড়েছিল। কানে আসছিল ছল-ছল নদীর শব্দ ; নৌকো তীরে বাঁধা ছিল। একটু-একটু দুলছিল।

ওর মাথার কাছে বসে মামু-দা গুনগুন গাইছিল আর একটুকরো বাঁশের চোঙে, নরুন দিয়ে কী যেন ছুলছিল। ও চোখ খুলতেই বলল, "এখানে খানিক দেরি হবে। মাল নামবে, নতুন মাল বোঝাই হবে। ছইয়ের ওধারে আমাদের গোছলখানা। উঠে, যাও সেখানে, হাতমুখ

ধোও। ওরই কিনারায় ময়লা ফেলার জায়গা। কোনও ভয় নেই। আমরা যাকে ময়লা বলে ফেলে দিই, মাছ-কাঁকড়ারা তাকেই খেয়ে পুষ্ট হয়। তখন আমরা আবার মাছ-কাঁকড়াদের ধরে খাই। এমনই দুনিয়ার খেল। ময়লা জিনিস বলে কিছু নেই গো। মাটিতে পুঁতে দিলে, গাছরাও তাই খেয়ে সুগন্ধি ফুল ধরায়। ময়লা বলে কিছু নেই, স্যাঙাত ; যেটুকু আছে তা মানুষের মনে। যাও, চটপট উঠে পড়ো। মাল বোঝাই হবে যতক্ষণ, তোমাকে একটু দুনিয়া দেখাই। তার আগে সবাই মিলে চাট্টি নাস্তা করা যাবে, কী বলো। সাফ জামা-প্যান্ট আছে তো ?"

ভিটু একটু হেসে পুঁটলি থেকে গামছা, হাতাওয়ালা গেঞ্জি, খাকি হাফপ্যান্ট বের করে নিল। মামু-দা ডেকে বলল, "ভিজে কাপড়-গামছা নিংড়ে এই দড়িটাতে মেলে দিও, এক ঘণ্টায় শুকিয়ে যাবে। দেরি কোরো না, গরম-গরম হাতরুটি আর তেল-পেঁয়াজ লঙ্কা মাখা আলুভর্তা খেতে কেমন মজা দ্যাখো। তোমাদের ডিমরুটি তার কাছে লাগে না। তবে একদিন ডিমের খিচুড়ি খাওয়াব, জন্মে ভুলবে না। চলে চলো, চলে চলো !"

পনেরো মিনিটের মধ্যে কাজ সেরে, ভিজে জামা-গামছা নিয়ে ভিটু ফিরে এল। মাসি অত বকাবকি করেন,অথচ এই তো কেমন চটপট গা মোছা, কাপড় কাচা হয়ে গেল ! সাবান পর্যন্ত লাগল না। মামু ভিজে জামা ওর হাত থেকে নিয়ে একটা উঁচুতে বাঁধা তারে ক্লিপ দিয়ে মেলে দিল। ফুরফুর করে সেগুলো উড়তে লাগল।

তারপর খাওয়া। কী যে ভাল ওই গরম-গরম হাতরুটি আর অল্প ঝাল আলুভর্তা, ভিটুর কোনও ধারণা ছিল না। চেটেপুটে খেয়ে কুলকুচি করে নিল। শুধু ওরাই নয়, বেশ ক'জন খাটো করে লুঙ্গিপরা লোকও নদীর পাড়ির ঢালে পা ছড়িয়ে বসে খেল। প্রত্যেকের নিজের কাছে জলের বোতল আছে, ভিটু দেখল।

পাড়িতে বসা লোকদের মধ্যে ভিটুর সমবয়সী কয়েকটা ছেলেও ছিল.। হাতকাটা নীল গেঞ্জি আর কালো হাফপ্যান্ট পরা। সব ক'টা একটু রোগাপানা। দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িতদের আনতে ভিটু যে বয়-স্কাউটদের সঙ্গে ঘাটালে গিয়েছিল, অনেকটা তাই। তবে এদের মুখ হাসিখুশি। একজন আবার ভিটুর দিকে চেয়ে চোখ মটকাল। ভিটুর তাকে ভাল লাগল।

ততক্ষণে মামু বাঁশের চোঙ খোদাই শেষ করে, চোঙের তলায় একটা সুন্দর অ খোদাই করেছে। ওকে বলল, "এটা তোর। অংশুমানের অ। অংশুমান মানে জানিস তো ?"

ভিটু লজ্জা পেয়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। মামু বলল, "অংশু হল কিরণ ; যার কিরণ আছে সে অংশুমান। যেমন তুই।" বলে খুব হাসল। ভিটু ইংরেজি মাধ্যমের স্কুলে পড়ে। বাংলায় কাঁচা। তাই লজ্জা পায়।

মামু চোঙটা তুলে বলল, "এই দ্যাখ, সব ভাষার বড় ভাষা। বই পড়ে শিখতে হয় না। চোখ অমনই চিনে নেয়। ভাষার চেয়ে বড় জিনিস চিনতে পারছিস ?"

ভিটু অবাক হয়ে দেখল চোঙের ওপর দেওয়ালে আঁকা তার সেই একপাল হরিণ এলোপাথাড়ি ছুটছে, ভয়ে তাদের চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। তাদের পেছনে জোড় পায়ে ছুটছে লম্বাটে এক ডোরাকাটা

১৯২৬ : ব্রিটিশ যাত্রী-বিমান আর্গোসি ও হারকিউলিস

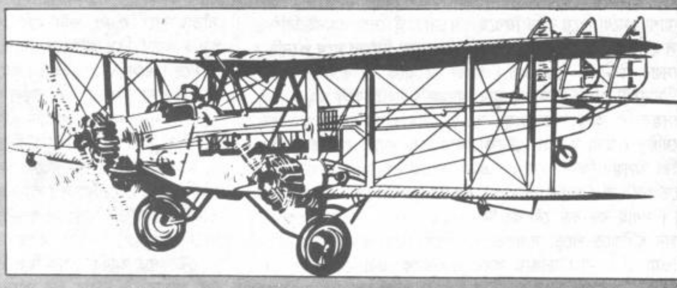

ইম্পিরিয়াল এয়ারওয়েজের যাত্রী-সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে প্রয়োজন হল একটু বড় আকারের বিমান। ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে দুটি ব্রিটিশ বিমান নির্মাণ সংস্থা তৈরি করলেন দুটি বিখ্যাত বিমান, যা ইম্পিরিয়াল এয়ারওয়েজ অনেকদিন ব্যবহার করেছে।

আমস্ট্রিং-হুইটওয়ার্থ নির্মিত আর্গোসি বিমান ছিল ইংল্যান্ডের প্রথম তিন এঞ্জিন বিশিষ্ট বিমান। বিমানটি প্রথমে লন্ডন-প্যারিস ও পরে ইউরোপের অন্যান্য শহরে চলাচল করতে থাকে। সবসুদ্ধ সাতটি বিমান তৈরি হয় ও শেষটি ১৯৩৫ সাল অবধি চলে।

১৯২৬-এর অন্য বিমানটি হল ডি· হ্যাভিল্যান্ড নির্মিত ডি এইচ-৬৬ হারকিউলিস। এটিও ছিল তিন এঞ্জিন বিশিষ্ট। মোট এগারোটি হারকিউলিস বিমান ইম্পিরিয়াল এয়ারওয়েজে বহু- ব্যবহৃত হয়েছে। ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে প্রথম ইংল্যান্ড-ভারত বিমানডাক ও যাত্রী চলাচল শুরু হয়, লন্ডন ও করাচির মধ্যে (তখন করাচি ভারতে ছিল)। ৩০ মার্চ লন্ডন (ক্রয়ডন বিমানবন্দর) থেকে একটি বিমান প্যারিস হয়ে সুইজারল্যান্ড অবধি আসে। পরবর্তী অংশ জেনোয়া অবধি রেলযোগে, জেনোয়া থেকে মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া অবধি শর্ট ক্যালকাটা ফ্লাইংবোটে, আর সেখান থেকে হারকিউলিস বিমান 'সিটি অব জেরুজালেম' করাচি উড়ে আসে বিভিন্ন স্থানে থেমে। ওই বছরের ডিসেম্বর মাসে বিমানপথ সম্প্রসারিত হয় দিল্লি অবধি, করাচি থেকে দিল্লি আসে হারকিউলিস বিমান 'দ্য সিটি অব দিল্লি'। ইংল্যান্ড-ভারত বিমানডাক উদ্বোধন উপলক্ষে ভারত সরকার একসেট এয়ারমেল ডাকটিকিট প্রকাশ করেন, তাতে ছিল হারকিউলিস বিমানের ছবি।

বিমানের বিশদ বিবরণ :
নির্মাতা : ডি· হ্যাভিল্যান্ড।
ডানার আয়তন : ২৪·২৩ মিঃ।
লম্বায় : ১৬·৯১ মিঃ।
বৈমানিক ও যাত্রী : তিনজন বৈমানিক ও সাতজন যাত্রী।
গতিবেগ : ঘণ্টায় ২০৬ কিলোমিটার।
এঞ্জিন : তিনটি ৪২০ অশ্বশক্তির জুপিটার-৬।

বাঘ। আর বাঘের পেছনে ঘাসের ঘাগরা পরা একজন বুনো লোক ধনুকে তীর লাগাচ্ছে!

অবাক হয়ে চেয়ে রইল ভিটু এ মানুষটা কে? যদি ছেলেধরাও হয়, যদি চোরাচালানিও করে, যদি দুষ্কৃতীও হয়, তবু ওর পায়ের ধুলো নিতে ইচ্ছে করছিল।

নেয়নি অবশ্য। খালি হাসি-হাসি মুখ করে বোকার মতো চেয়ে, চোঙাটা নেওয়ার জন্য দু'হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। মামু-দা বলল, "রোস! রং করতে হবে না? কড়া চায়ে ডুবিয়ে রাখব, তবেই আমাদের কাজ চলে যাবে। সন্ধ্যায় পাবি। পাকা রং ধরে যাবে। আজ জাপু, হরিয়া, আজিম, এদের সঙ্গে এখানকার পুরনো বাড়িটা দেখে আয়। সেটাকে মালগুদোম করা যায় কিনা। নাকি ভূতের বাড়ি। বে-ওয়ারিশ।

"ভূতের ভয় নেই তো তোর? তা থাকলেও রাতে তো আর ওখানে যাচ্ছিস না। দিনে-দিনে ফিরবি। দিনেরবেলা ভূতরা আর-পাঁচজনের মতোই হয়ে যায়। খায় দায়, গান গায়, কাজ করে, চেনা যায় না। রাতে ভূত বনলেও তার অনেক আগে তোরা ফিরে আসবি। ভূতের ভয় ভাল। গাঁয়ের লোক জায়গাটা এড়িয়ে চলে, চুরি-চামারির ভয় থাকে না। অবশ্য পেশাদার চোররা তার মধ্যেই সুবিধে করে নেয়। আর বাপু, বকাসনি আমাকে, রওনা দে, রওনা দে। খিদে পেলে পাহাড়তলি গাঁ-তে নাস্তা করিস, ওরে জাপু, হরিয়া রওনা দে, রওনা দে। বিকেল থাকতে ফিরিস বাপ। আমি এখানে মাল পাচার করার চেনা মানুষ ভাড়া করি। আঁটঘাট বেঁধে কাজে এগোতে হয়।" এই বলে মামু আবার নরুন তুলে নিল।

দূরে কোথায় জাহাজে ভোঁ দিল।

অঙ্কে যতই কম নম্বর পাক ভিটু, চালাক-চতুর কম ছিল না। সহজে ঘাবড়াত না। বুকটা ঢিপঢিপ করলেও, বাইরে জানান দিত না। ড্রইং-সার বলেন, "মনের ভয় কেউ দেখতে পায় না। বাইরে জানান না দিলেই হল।"

পাড়ি বেয়ে ওপরে উঠতেই মুদির খুদে দোকানের আড়ালে যে-লোকটা সরে গেল, তাকে চিনতে ভিটুর কোনও অসুবিধেই হল না। তবে সে ওই একটা চোখ আর খোঁড়া ঠ্যাং নিয়ে রাতারাতি নৌকোর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কী করে এতদূরে পৌঁছে গিয়ে আবার ওদের পিছু নিয়েছে আর কেনই বা নিয়েছে, তা ভেবে পেল না ভিটু। ও কোনও রাজা-রাজড়ার ছেলে হলেও বোঝা যেত। সিংহাসনের লোভে পেছনে কেউ গুপ্ত গোয়েন্দা লাগিয়েছে। আর শুধু লাগিয়েছে না, মোটা টাকা নিশ্চয় দিয়েছে। কারণ এক রাত্তিরেই যেন তাকে কিঞ্চিৎ পুরুষ্টু মনে হচ্ছিল। ওই নৌকোতেই গা-ঢাকা দিয়ে ছিল কিনা কে জানে। হয়তো ভাবনার কিছু কারণ নেই। মামুরই গুপ্তচর ও। ওদের দেহরক্ষী করে পাঠিয়েছে। অবশ্য বেচারা ওই তিন-বাঁকা শরীর আর কানা চোখ নিয়ে কত দেহ রক্ষা করবে ভেবেও হাসি পেল। তবে কোমরে পিস্তল গোঁজা থাকতে পারে। আহা, খাসা ছবি আঁকা যেত ওর। নাম দেওয়া যেত 'হতভাগা'। তার বেশ দুটো মানেও করা যায়। একটা হল যার বরাত মন্দ আর অন্যটা হল পাজি-বজ্জাত। সম্ভবত তাই।

॥ ৪ ॥

ছেলেগুলোর নাম জাপু, হরিয়া, আজিম, নাটু, জালাল। ভারী স্ফূর্তিবাজ ওরা। ওই তো রোগা টিংটিঙে চেহারা, তাই নিয়েই দৌড়ে চলে, লাফিয়ে চলে, এমনই হেঁটে চলে না কেউ। সাত জন্মে কেউ গান শেখেনি বোঝা যায়, তবু স্ফূর্তির চোটে গলা ছেড়ে গান ধরে–

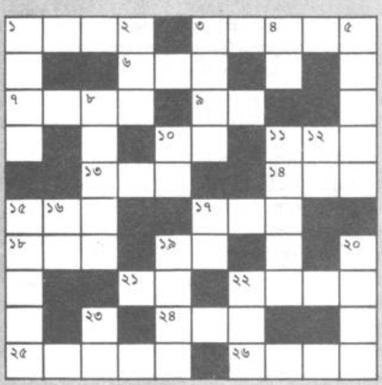

সঙ্কেত : পাশাপাশি : (১) বিখ্যাত আগ্নেয়গিরি। (৩) তাসের দেশের রাজা-রানি। (৬) তরল পদার্থের মাপ। (৭) উজ্জ্বল ডানার পতঙ্গবিশেষ। (৯) এ-অঞ্চল উত্তরে ভাল, দক্ষিণে খারাপ। (১০) ত্যাজ্য, ঘৃণ্য। (১১) অজ্ঞাতনামা, অনির্দিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তু। (১৩) শূল। (১৪) ফুল থেকে মালা হয়, আবার ফল থেকেও হয়—কী সে ফল? (১৫) অর্কপুষ্প। (১৭) 'বহে মাঘমাসে শীতের বাতাস, স্বচ্ছসলিলা —।' (১৮) আর্ত, দুঃখে অভিভূত। (১৯) কুঁড়ি। (২১) ফরাসি বাঘ-সিংহ। (২২) জ্যোতিষে অশুভ সময়। (২৪) পক্ষ। (২৫) কোটাল। (২৬) মেয়ে কার, নাকি ঐতিহাসিক প্রান্তর?

উপর-নীচ : (১) এতে জ্বলন্ত প্রদীপ নেভে, কিন্তু নিভন্ত আগুন জ্বলে। (২) '— পরিলে গলে প্রতি ফুলে কেবা মনে রাখে'। (৩) কুকুর। (৪) আগুন। (৫) বড়-বড় রেলস্টেশনে যাত্রীদের জন্য। (৮) কোন বন্দর গান্ধীজির কথা মনে পড়ায়? (১০) চন্দ্রযোগে বিখ্যাত কবি। (১১) এই রাজ্যের রাজধানী ইটানগর। (১২) কাঁচা টাকা-পয়সা। (১৫) বিমান। (১৬) কী পরিমাণ? (১৭) বিষ্ণু-কর্তৃক বিজিত দৈত্যরাজ। (১৯) হাতের তেলো। (২০) সুকুমার রায়ের লেখা নাটক। (২২) বিখ্যাত জার্মানি লেখক, মাত্র চল্লিশ বছর বয়সে মারা যান। (২৩) চিৎকার।

গত সংখ্যার সমাধান

নী	হা	রি	কা			অ	কৈ	ত	ব
রা			ম	হী	রু	হ			ক
জ	ল	ভ	রা			র	সা	ত	ল
ন	ব		ঙা			হ		রো	ম
	কু	স্ত		শা	ব		গো	য়া	
বে	শ		ই	মা	র	ত		ল	ব
ও		কে	চ্ছা			র	শি		শ
য়া			পূ	জা	রি	ণী			ং
রি	রি		র			সে		শ	ব
স	ম	র্প	ণ			ন	গ্ন	প	দ

ওরে মোর পরান পাখি,
কেমনে তোরে বাইন্ধা রাখি,
ডানা ঝাপটে মরবি শ্যাষে,
উইড়া যাবি অচিন দ্যাশে,
পাখি র‍্যা-অ্যা !

তারপরেই আবার চমকে উঠে এ ওর মুখ চেয়ে একেবারে চুপ। একটু অদ্ভুত যে ওই ছেলেগুলো, তাতে সন্দেহ নেই। মনের মধ্যে কোনও ভয়ের কথা লুকিয়ে রেখেছে। সেবার দাদুর চিন থেকে আনা ফুলদানিটা আচমকা ভেঙে ফেলে ভিটুর যেমন হয়েছিল কেউ টের পায়নি। ভেবেছিল বুঝি পরদা উড়ে লাগতে পড়ে গেছে। কিন্তু ভিটু ঘুমোতে পারেনি। শেষটা দাদুকে গিয়ে বলেছিল। দাদু মাথায় হাত বুলিয়ে বলেছিলেন, "দুর বোকা, তাই বলে চোখে জল ? ওটা তো আমি তোকেই দিয়েছিলাম। বল লেগে ভেঙে গেছে তো কী হয়েছে ? চিনে দোকান আছে নিউ মার্কেটে, সেখানে ঢের কিনতে পাওয়া যায়।" অমনই মন ভাল হয়ে গিয়েছিল। দাদুর মতো কেউ হয় না। তবে মামু মানুষটাও ভাল। কেমন চেনা-চেনা লাগে। হোকগে দুষ্কৃতী।

পাহাড়ই বলুক আর যাই বলুক, এগুলো আসলে মস্ত-মস্ত ঢিবি ছাড়া আর কিছু নয়। এরকম ঢিবি অনেক সময় চ্যাপটা জায়গায় দেখা যায়। বড়কাকা জাদুঘরের লাইব্রেরি থেকে একটা বই এনেছিলেন, তাতে এইরকম অনেক খুদে-খুদে পাহাড়ের ছবি ছিল। পুরাতত্ত্ববিদরা বলেন সেগুলোকে খুঁড়লে অনেক সময় পুরাকালে তৈরি বড়-বড় মন্দির, দুর্গ, প্রাসাদ বেরোয়।

ওঁরা একবার অফিস থেকে দল বেঁধে বীরভূমে একটা জায়গায় একটা ঢিবি কাটা হচ্ছে দেখতে গিয়েছিলেন। সেখানে এক সময় নাকি চণ্ডীদাস ছিলেন। ওই ঢিবিটা খুব যত্ন করে কাটা হচ্ছিল। বড়কাকারা দেখে এলেন ক্রমে বাশুলীদেবীর মন্দিরের ওপরকার মাটি একটু-একটু করে তোলার ফলে দেবীর মূর্তি আর মন্দিরের ভিত ঘিরে বড়-বড় পাথরের ফলকে হাতখোদাই করা নানারকম দেব-দেবতা আর অবতারের মূর্তি বেরিয়ে পড়ছে।

ভিটু ভাবল এত সুন্দর জিনিস একটু-একটু করে মাটিচাপা পড়ে গেল আর বাশুলীদেবীর উপাসকরা কেউ তা বন্ধ করতে পারল না। কে জানে পথের ধারের এই ছোট পাহাড়টার তলাতেও হয়তো অনেক প্রাসাদ মন্দির আছে। লোকেরা সব ভুলে গেছে। স্কুলের লাইব্রেরির একটা বইয়ে লেখা আছে, অনেককাল আগে ভিসুভিয়াস পাহাড়ের সাঙ্ঘাতিক অগ্নিকাণ্ড হয়ে পম্পিআই আর হারকুলেনিয়ম বলে দুটো শহর এমনই গলানো পাথর আর ছাই চাপা পড়ে গিয়েছিল যে, শেষ পর্যন্ত লোকে ও দুটো শহরের কথা বেমালুম ভুলেই গিয়েছিল। তারপর মাঝে-মাঝে পাহাড়ের গায়ে লাঙল চালাতে গিয়ে লাঙলের ফলায় খোদাই করা সুন্দর মূর্তি, সোনার মোহর, কিংবা ছোট একটা গয়নার টুকরো উঠে আসতে লাগল। শেষ পর্যন্ত পুরাতত্ত্ববিদরা মাটি খুঁড়ে প্রাচীন শহর দুটির অনেকখানিকে দিনের আলোতে বের করেছিলেন। সরাইখানার উনুনের কয়লা, হাঁড়িতে কিছু রান্না হচ্ছিল, সব পাথর হয়ে আছে। বাড়ির দেওয়ালে কোথাও মজার কথা, কোথাও গালাগাল কাঠকয়লা দিয়ে লেখা রয়েছে। দেখলে নাকি গা শিউরে ওঠে।

এখানেও যদি সেরকম পাওয়া যায় ? সেকালের কি ছবি, কি মূর্তি সব আঁকাই খুব পাকা হাতের না হলেও মনে হয় সব কিছু যেন এক্ষুনি নড়বে-চড়বে, ছুটবে, কথা কইবে। এখানেও যদি সেইরকম কিছু খুঁজে পায় ওরা ? কী মজাই হয় !

পাহাড়ের নীচের দিকটা খুব খাড়া, সকলের হাঁপ ধরে যাচ্ছিল। মুখ বুজে নিশ্বাস ফেলছিল সবাই, গল্প করছিল না। পথ বলে কিছু একটা ছিল হয়তো এককালে। ভাঙা বাড়ি আছে যখন, বাসিন্দারা নিশ্চয় ওঠা-নামা করত ; তাতে হাঁটাচলার পথ তো কিছু আপনিই তৈরি হয়ে যায়। জাপুদা আগে যাচ্ছিল। তার পা লেগে একটা গোল পাথর গড়িয়ে এসে, ভিটুর পায়ের কাছে থামল। ভিটু সেটা তুলে নিয়ে দেখল—তাতে নকশা কাটা। গায়ে কাঁটা দিল। ইচ্ছে করল জল দিয়ে ধুয়ে দ্যাখে। কিন্তু বোতলের জল নষ্ট করা যায় না। পকেটে পুরল।

সোজা ওঠেনি পথটা, এঁকেবেঁকেই উঠেছিল, সব পাহাড়ি-পথ যেমন করে। তবে এটা তো আর ঠিক পাহাড় নয়, বরং ঢিবি। ভিটুর অভ্যাস নেই, তাই হাঁপ ধরে যাচ্ছিল। জাপুদা, হরিয়াদা কোনকালে ওপরে পৌঁছে, পা ছড়িয়ে বসে ছিল। শেষের দিকে বাঁধানো সিঁড়ির চিহ্ন। সিঁড়ি যেখানে শেষ হয়েছে, সেখান থেকে কেউ এককালে ছোট-ছোট ইট দিয়ে পাঁচিল বানিয়েছিল। জায়গায়-জায়গায় ছোট ইটের পাঁচিল বড়-বড় ইট দিয়ে মেরামত করা হয়েছিল। সবই এখন নড়বড়ে হয়ে গেছে। কোনও জায়গায় ভেঙে পড়েছে। বাড়িটার জানলার কাচ ভাঙা। দরজায় মস্ত তালা দেওয়া, কিন্তু সবসুদ্ধ ঝুলে পড়েছে।

ছোট ছেলেগুলোরও একে রোগা শরীর তায় পাহাড়ে চড়ার অভ্যাস নেই। সবার যেন জিভ ঝুলে পড়েছে। তবু এদিক থেকে যতদূর মনে হচ্ছিল, পোড়োবাড়ি বললে যা বোঝায়, এটা ঠিক তা নয়। তবে সত্তর-আশি বছর কেউ বাস করেছে বলে মনে হয় না। এইরকমই বলছিল মামু। অল্পদূরেই একটা গাঁয়ে ওদের বাড়ি। ওর বাপ-ঠাকুরদার আমলে কেউ নাকি এখানে বাস করেনি। ভারী দুর্নাম বাড়িটার। বাড়ির কথা ছেড়ে দাও, সূর্য ডুবলে পাহাড়টাতেই কেউ পা

দেয় না। তাই অমন সুন্দর গাছগাছালি হয়ে আছে।

একটা পাহারাওলা পর্যন্ত রাখা যায় না। পাঁচ ভূতের বাড়ি যাকে বলে। তার মানে প্রেতের ব্যাপার নয়। শরিকে-শরিকে ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে রেষারেষি। সে আজ তিন পুরুষ ধরে চললে যা হয়। কেউ ভাড়া নিতেও সাহস পায় না। আসল মালিক কে তারই ঠিক নেই, ভাড়া নেবে লোকে কোন সাহসে? নইলে খাসা এক স্বাস্থ্যনিবাস হতে পারত এখানে। আর সে কী দৃশ্য! কিছু নদী এঁকেবেঁকে চলেছে; এখানে-ওখানে গাঁ দেখা যাচ্ছে; আরও দূরে রেলের লাইনের সিগন্যাল পোস্টও চোখে পড়ছে।

জাপুদা বলল, "কী রে চুনোপুঁটিরা, এখানে একটা বে-আইনি হোটেল করলে তোরা পেছনে আছিস তো? আয়, সবাই মিলে বড়লোক বনে যাই।"

হঠাৎ আজিম, নাটু, জালাল কেমন ব্যস্ত হয়ে উঠে বলল, "কখনও না, কখনও না। গরিবরাই সুখে থাকে। বড়লোকের ছেলেদের দুষ্টু লোকরা ধরে নিয়ে গিয়ে টাকা চায়। বাপ-মা'দের ধরে নিয়ে বলে, "অমুক গাছের কোটরে হাজার টাকা রাখলে ছেলে ফিরে পাবে। কিন্তু কক্ষনো ফিরিয়ে দেয় না।" এই বলে ছোট ছেলে তিনটে কেঁদে ভাসাল।

জাপুদা, হরিয়াদা ব্যস্ত হয়ে উঠল, "কী জ্বালা, কেঁদে কী হবে? আমাদের তো চোখের জল কবে শুকিয়ে গেছে আর কাঁদতে পারি না। মামু সব ঠিক করে দেবেন। বলেছেনই তো। তাঁর কথা বিশ্বাস করিস না নাকি?"

জাপু, হরিয়াকে ভিটুর ১৩-১৪ বছর বয়সের মনে হয়েছিল। তাই একটা দাদা জুড়ে খুশি করে দিয়েছিল। আজিম, নাটু, জালালকে ৯-১০-এর বেশি মনে হল না। ওদের জন্য ভারী দুঃখ হচ্ছিল। তাই উঠে পড়ে ভিটু বলল, "তোদের আবার ভাবনা কিসের? আমার দুটো মা, দুটো বাবা আছেন। তাঁরা খুশি হয়ে তোদের ভাগ করে নেবেন। কেমন ভাল-ভাল মা-বাবা পাবি দেখিস। মামু সব ঠিক করে দেবেন। মামুকে বিশ্বাস করিস না?"

অমনই ওদের মুখে হাসি দেখা দিল। জাপুদা, হরিয়াদাও যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। ভিটুর পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলল, "পারিস বাপু তুই।"

ভিটু বলল, "ওরে কাচ্চা-বাচ্চারা, আগে কাজ, পরে কথা। আচ্ছা, ওই যে একচোখো খোঁড়া লোকটিকে প্রায়ই দেখি, ও কে? ভাল লোক তো?"

জাপুদা বলল, "ঠিক জানি না। মামুর চর বোধ হয়। খবর সরবরাহ করে। সামনাসামনি দেখা দেয় না। কেমন লোক কে জানে।"

ভিটু ততক্ষণে ভাঙা বাড়ির ফটকটা দেখতে পেয়েছে। ইয়া মোটা লোহার শেকল বাঁধা। অ্যাত্ত বড় লোহার তালা ঝুলছে। মরচে ধরে ঝুরঝুর করছে। ওরা সেদিকে গেলই না। পেছনে কোনও চিহ্ন না রেখে যাওয়াই ভাল। পাশের দেওয়াল ভেঙে পড়েছে। অর্থাৎ ফটকটা কিচ্ছু-নাকে রক্ষা করছে। সেখান দিয়ে ওরা দিব্যি সুন্দর ভেতরে ঢুকে পড়ল। পাথুরে ভিতের ওপর মস্ত একতলা বাড়িটা যেন রোদ্দুরে শুয়ে ঝিমোচ্ছে। পাথরের ফাটলে ফোকরে একরকম ডোরাকাটা ঘাস গজিয়েছে। ওই ঘাস পাহাড়ি জায়গায় ভিটু আরও দেখেছে। কিনারাটা বেজায় ধারাল আর ভারী সুন্দর গন্ধ হয় ওগুলোর। দেখে মনটা ভাল হয়ে গেল। ঠাকুমা ঠিকই বলেন, বিধাতা বড় ভাল। নালা-নর্দমার পাশে ফুল ফুটিয়ে দেন। কিন্তু তা হলে ছোট ছেলেমেয়েরা তবু দুঃখ পায় কেন, তা ভিটু ভেবে পায় না।

ভিটু আজিম, নাটু, জালালকে বলে "তোরা আমার সঙ্গে-সঙ্গে চল। ছাড়াছাড়ি হওয়া ঠিক নয়।"

জাপুদা বলল, "আমি ভাবছিলাম দু' দল হয়ে খোঁজাখুঁজি করলে তাড়াতাড়ি হত।"

ভিটু হেসে বলল, "যাদের হাতে সারাদিন পড়ে রয়েছে তাদের তাড়াহুড়োর দরকার কী? একসঙ্গে থাকাই নিরাপদ। জায়গাটার কি মিছিমিছি বদনাম হয়েছে। একটা ছোট জন্তু-জানোয়ার পর্যন্ত দেখছি না। অনেক সময় চোরাই ফাঁদ পাতা থাকে। তাতে পা পড়লে নিখোঁজ হয়ে যায় লোকে। তাই সবাই সবার নজরবন্দী থাকা নিরাপদ। কাছাকাছি, কিন্তু একটু তফাতে-তফাতে, জটলা পাকিয়ে নয়। চ্যাঙ-ব্যাঙরা কী বলিস?"

আজিম হঠাৎ বলল, "মামু আমাদের প্রত্যেকের কোমরে মোটা দড়ি বেঁধে দিয়েছেন। বলেছেন, সবার সঙ্গে সবাই বাঁধা থাকবে, কিন্তু একটু দূরে-দূরে। পাহাড়-চড়ুয়ারা নাকি ওইভাবে খাড়া পাহাড় চড়ে। একজনের পা ফসকালেও সে তলিয়ে যায় না, ঝুলে থাকে।"

মামুর কথা যতই শোনে ততই ভক্তি হয় ভিটুর। এত বুদ্ধি ধরে, তবু সে লাখপতি হয়ে যায়নি কেন? মুখে কিছু বলেনি সে, কিন্তু হরিয়াদা আঁচ করে নিয়ে বলল, "তা তিনি যতই বুদ্ধি ধরুন, ট্যাঁক সর্বদা গড়ের মাঠ। সবাইকে খাইয়ে-পরিয়ে নিজের জন্য কিচ্ছু রাখেন না। আবার বলেন, টাকাকড়ি চালু থাকবে। জমা করলেই মরচে ধরে যায়। বাটপাড়ে ছিনিয়ে নেয়। তোমার হাসি পাচ্ছে কেন, ভাই?"

ভিটু বলল, "না, কথাটা শুনে মজা লাগল। বেশ বলেছে, ঠিক বলেছে! আচ্ছা, এ-বাড়িতে কোনও ফাঁদ পাতা মনে হচ্ছে না তো। সদর দরজা তো। কবজাও ভেঙে ঝুলছে, যার খুশি ঢুকতে পারে। ও কিসের শব্দ?"

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

ছবি : দেবাশিস দেব

কেরিয়ার গাইড

মানসিক প্রতিবন্ধকতার পাঠক্রম

আমাদের দেশে মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুর সংখ্যা ক্রমশই বাড়ছে। তাদের প্রতিপালন এবং শিক্ষাদীক্ষার সমস্যা সাধারণ শিশুদের চেয়ে একটু আলাদা ধরনের। এজন্য দরকার বিশেষ ধরনের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুশলী শিক্ষক। তা ছাড়া তাদের মানসিক বিকাশের জন্য বিশেষ ধরনের স্কুলও দরকার। এই সমস্যার গুরুত্ব উপলব্ধি করেই ভারত সরকারের কল্যাণ মন্ত্রকের উদ্যোগে সেকেন্দ্রাবাদে একটি স্বশাসিত শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠিত হয়, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর দ্য মেন্টালি হ্যান্ডিক্যাপড। জাতীয় এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য হল: মানসিক প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্য দক্ষ কর্মী তৈরি।

কোন বিষয় পড়ানো হয়

মানসিক প্রতিবন্ধকতা বিষয়ে তিন বছরের একটি ডিগ্রি কোর্স পড়ানো হয় এখানে। কোর্সটি হল, ব্যাচেলর্স ডিগ্রি কোর্স ইন মেন্টাল রিটার্ডেশন অর্থাৎ বি· এম· আর। এই কোর্সটি ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদিত। প্রতি বছর জুলাই মাসে কোর্সটি শুরু হয়। এ ছাড়া বিভিন্ন মানসিক প্রতিবন্ধী স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার উদ্দেশ্যে এক বছরের একটি ডিপ্লোমা কোর্স পড়ানো হয়, ডিপ্লোমা ইন মেন্টাল রিটার্ডেশন অর্থাৎ ডি· এম· আর। এই কোর্সটি সেকেন্দ্রাবাদ ছাড়াও ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর দ্য মেন্টালি হ্যান্ডিক্যাপডের বিভিন্ন আঞ্চলিক কেন্দ্রে—বোম্বাই, দিল্লি, কলকাতায় পড়ানো হয়। এ ছাড়াও ইনস্টিটিউট বিভিন্ন সময়ে কর্মরত

অন্ধ্রপ্রদেশের সেকেন্দ্রাবাদের বাওয়ানপল্লীতে রাষ্ট্রীয় মানসিক বিকলাঙ্গ সংস্থানের প্রতিষ্ঠা হয় ১৯৮৪ সালে। ভারত সরকারের কল্যাণ মন্ত্রক এটিকে একটি স্বয়ংশাসিত সংস্থার রূপ দিয়েছেন। প্রতিষ্ঠানটির বৈশিষ্ট্য হল:

(১) ক্যাম্পাসের মধ্যেই আছে ফ্যাকাল্টি, প্রশাসনিক ও সার্ভিস ব্লক, স্পেশ্যাল এডুকেশন সেন্টার, ওয়ার্কশপ—হাতে-কলমে কাজ শেখার অপূর্ব সুযোগ।

(২) মানসিক বৈকল্য দূর করার কাজে কুশলী কর্মী তৈরির জন্য প্রতিষ্ঠানটি মানসিক প্রতিবন্ধকতা বিষয়ে ডিপ্লোমা এবং ডিগ্রি কোর্সের প্রবর্তন করেছেন।

(৩) এখানে পড়ার সময় প্রতিটি ছাত্রছাত্রী মাসিক ভাতা পেতে পারে।

(৪) ভর্তির ক্ষেত্রে রাজ্যভিত্তিক কোটা আছে।

(৫) পাঠক্রম শেষে চাকরি পাওয়ার যেমন সুযোগ আছে তেমনই নিজের উদ্যোগে মানসিক প্রতিবন্ধী স্কুল ও ক্লিনিক খোলা যেতে পারে।

শিক্ষক এবং পেশাদার কর্মীদের জন্য স্বল্প সময়ের রিফ্রেশারস কোর্স পরিচালনা করে থাকেন। এই রিফ্রেশারস কোর্সের মাধ্যমে তারা মানসিক প্রতিবন্ধকতা দূর করার ক্ষেত্রে আধুনিক জ্ঞান এবং তথ্য বিষয়ে জানতে পারেন।

ভর্তির যোগ্যতা

ব্যাচেলর্স ডিগ্রি কোর্স অর্থাৎ বি· এম· আর কোর্সে ভর্তি হতে হলে প্রার্থীকে ১০+২ পর্যায়ে উচ্চ মাধ্যমিক অথবা ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় পাশ করতে হবে। কম্বিনেশন বিষয়ে কোনও বাধ্যবাধকতা নেই, তবে ওই পরীক্ষায় এগ্রিগেটে শতকরা ৫০ নম্বর পেয়ে পাশ করা চাই। তফসিলি জাতি উপজাতির প্রার্থীদের ক্ষেত্রে অবশ্যই এগ্রিগেটে ৪০ শতাংশ নম্বর পেলেই আবেদন করা যাবে। ভর্তির বছরে জুলাই মাসের প্রথম দিনে প্রার্থীর বয়স হওয়া চাই কমপক্ষে ১৬ বছর। যেসব প্রার্থী অন্তত দু' বছর বিভিন্ন মানসিক প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকার কাজ করছেন তাঁরা ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন। তবে কমপক্ষে তাঁদের মাধ্যমিক পাশ করা দরকার; বয়স হওয়া চাই ৩৫ বছরের কম এবং বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যেন সেই প্রার্থীদের স্পনসর্ড করেন। উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষকদের ভর্তির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়।

সিলেবাস

সেকেন্দ্রাবাদের জাতীয় কেন্দ্রে ইংরেজি ভাষায় পড়ানো হয়। বি· এম· আর ডিগ্রি কোর্সের বিষয়গুলো দুটি অংশে বিভক্ত। পার্ট-১ অংশে আছে—ইংরেজি

অমর দাশ

এবং দ্বিতীয় ভাষা। দ্বিতীয় ভাষার মধ্যে হিন্দি, তেলুগু অথবা ফরাসি যে-কোনও একটি বেছে নিতে হবে। ল্যাঙ্গুয়েজের এই বিষয়গুলো প্রথম এবং দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ানো হয়। পার্ট-২ অংশে আছে—সাইকোলজি, স্পেশ্যাল এডুকেশন এবং নিউরোবায়োলজি। এই বিষয়গুলো তিন বছর ধরেই পড়ানো হয়। প্রতি শিক্ষাবর্ষ শেষে ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনায় বার্ষিক পরীক্ষা নেওয়া হয়ে থাকে। প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে ৫টি পেপারে এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে ৬টি পেপারে পরীক্ষা নেওয়া হয়। এ ছাড়া প্রাকটিক্যাল এবং মৌখিক পরীক্ষাও নেওয়া হয়। কোর্স শেষে সফল প্রার্থীদের ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ডিগ্রি প্রদান করেন।

ডি· এম· আর কোর্সে একটি শিক্ষাবর্ষে মোট ১২০০ ঘণ্টা ক্লাস হয়। এর মধ্যে ১৫ দিন নির্দিষ্ট থাকে শিক্ষামূলক ভ্রমণের জন্য। ৫টি থিওরি পেপার এবং ৪টি প্রাকটিক্যাল পেপারের ওপর পরীক্ষা নেওয়া হয়। বিভিন্ন আঞ্চলিক কেন্দ্রে স্থানীয় ভাষা-মাধ্যমেই পড়ানো হয়। তবে ভিন্নভাষী প্রার্থীদের জন্য ইংরেজি ভাষাতেও বিষয় বোঝানো হয়। প্রতিদিনের ৬ ঘণ্টার রুটিনে সকালের তিন ঘণ্টা সময় নির্দিষ্ট থাকে মানসিক প্রতিবন্ধীদের পড়ানো, ফিজিক্যাল ট্রেনিং ইত্যাদি বিষয়ের জন্য। বিকেলের ৩ ঘণ্টা সময়ে লেকচার, লাইব্রেরি ওয়ার্ক, ডিসকাশন ইত্যাদির জন্য নির্দিষ্ট। মাঝে-মাঝে গেস্ট লেকচারার এসে মেডিকেল সায়েন্স, স্পিচ প্যাথোলজি, অডিওলজি, ফিজিওথেরাপি, অকুপেশনাল থেরাপি ইত্যাদি বিষয়ে পড়িয়ে যান। কোনও পেপারে শতকরা ৪০ নম্বর না পেলে প্রার্থীকে অসফল বিবেচনা করা হয়। শতকরা ৭০ নম্বর বা বেশি পেয়ে পাশ করলে তাকে ডিস্টিংশন সহ ডিপ্লোমা দেওয়া হয়।

পড়াশোনার খরচ

সেকেন্দ্রাবাদের জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় নির্ধারিত ভর্তি ফি ইত্যাদি নেওয়া হয়। বি· এম· আর কোর্সে ভর্তির সময় ইউনিভার্সিটি রেজিস্ট্রেশন ফি লাগে ৫ টাকা, এক বছরের জন্য টিউশন ফি বাবদ ১৫০ টাকা, পরীক্ষার ফি ৫৭ টাকা এবং কশন ডিপোজিট ১০০ টাকা। টিউশন ফি'র টাকা দুটি কিস্তিতে দেওয়া যেতে পারে।

ডি· এম· আর কোর্সে পাঠরত ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে কোনওরকম খরচপত্র আদায় করা হয় না।

শিক্ষাক্রম

বি· এম· আর এবং ডি· এম· আর যথাক্রমে তিন বছর ও এক বছরের কোর্স। সারা দেশ থেকে মোট ১৭ জন প্রার্থীকে বি· এম· আর কোর্সের জন্য মনোনীত করা হয়। ডি· এম· আর কোর্সের ক্ষেত্রে প্রতিটি আঞ্চলিক কেন্দ্রে ১৫ জন প্রার্থীকে

ভর্তি করা হয়। এজন্য বিভিন্ন রাজ্যকে ভাগ করে এক-একটি আঞ্চলিক কেন্দ্রের অধীনে দেওয়া হয়েছে। নতুন দিল্লি কেন্দ্রের আওতায় আছে চণ্ডীগড়, দিল্লি, হরিয়ানা, হিমাচলপ্রদেশ, জম্মু ও কাশ্মির এবং পঞ্জাব রাজ্যের প্রার্থীরা। কলকাতায় পূর্বাঞ্চলীয় আঞ্চলিক কেন্দ্রের আওতায় রয়েছে বিহার, সিকিম এবং পশ্চিমবঙ্গ। বিহারের জন্য ৭টি আসন, সিকিমের ২টি এবং পশ্চিমবঙ্গের জন্য ৬টি আসন। ওড়িশার প্রার্থীদের জন্য ভুবনেশ্বরের চেতনা ইনস্টিটিউট ফর দ্য মেন্টালি হ্যান্ডিক্যাপড আঞ্চলিক কেন্দ্রে ১৫টি আসন আছে। উত্তর-পূর্ব আঞ্চলিক কেন্দ্র গুয়াহাটির মন-বিকাশ কেন্দ্রে অসমের জন্য ৩টি, অরুণাচল প্রদেশের জন্য ২টি, মণিপুরের জন্য ২টি, মেঘালয়ের জন্য ২টি, মিজোরামের জন্য ২টি, নাগাল্যান্ড এবং ত্রিপুরার জন্য ২টি করে আসন আছে। এ ছাড়া বাকি রাজ্যগুলোর জন্য বোম্বাই, হায়দরাবাদ, কর্নাটকের উডুপি, লখনউ এবং মাদ্রাজে আঞ্চলিক মানসিক প্রতিবন্ধী জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্র আছে।

হস্টেলের সুযোগ

সাধারণত বাইরের ছাত্রছাত্রীদের জন্য হস্টেলে থাকা-খাওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়। এজন্য প্রয়োজনীয় খরচপত্র ছাত্রছাত্রীকেই বহন করতে হয়। ⬅

ভর্তির পদ্ধতি

মেধার ভিত্তিতে সারা দেশ থেকে অর্থাৎ উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম চারটি জোন থেকেই প্রার্থী বাছাই করা হয়। উচ্চ মাধ্যমিক বা ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় পাওয়া নম্বর যেমন বিবেচনা করা হয়, তেমনই অ্যাপটিচুড টেস্টের ফলাফলও বিচার করা হয়। প্রতিটি জোন থেকে একটি করে আসন তফসিলি প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত আছে। এ ছাড়া তফসিলি উপজাতি প্রার্থীদের জন্যও একটি আসন (সারা দেশের জন্য) সংরক্ষিত আছে। যদি প্রয়োজনীয় তফসিলি জাতি বা উপজাতি প্রার্থী না পাওয়া যায় তা হলে সাধারণ প্রার্থীদের তালিকা থেকেই আসন পূরণ করা হয়।

প্রতি বছর মার্চ-এপ্রিল মাস নাগাদ বি· এম· আর কোর্সের জন্য প্রার্থীদের কাছ থেকে আবেদনপত্র চাওয়া হয়। এজন্য বিভিন্ন জাতীয় সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপনও দেওয়া হয়। পাঁচ টাকার পোস্টাল অর্ডার বা ব্যাঙ্ক ড্রাফট (বিজ্ঞাপনের নির্দেশমতো) পাঠালে ডিরেক্টর, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর দ্য মেন্টালি হ্যান্ডিক্যাপড, মনোবিকাশ নগর, বাওয়ানপল্লী, সেকেন্দ্রাবাদ-৫০০ ০১১ ঠিকানা থেকে আবেদনের ফর্ম এবং প্রসপেকটাস সংগ্রহ করা যায়। পূরণ করা আবেদনপত্র বিভিন্ন সার্টিফিকেটের প্রত্যয়িত নকলসহ রেজিস্টার্ড ডাকযোগে ডিরেক্টরের ঠিকানায় বিজ্ঞাপিত সময়ের মধ্যে পাঠাতে হয়। খামের ওপর পরিষ্কার করে লিখতে হয়: অ্যাপ্লিকেশন ফর অ্যাডমিশন টু ব্যাচেলর্স ডিগ্রি কোর্স ইন মেন্টাল রিটার্ডেশন।

ডি· এম· আর কোর্সের জন্য আবেদনপত্র বিভিন্ন আঞ্চলিক কেন্দ্র থেকেই সংগ্রহ করতে হয়। কলকাতা কেন্দ্রের অফিস বনহুগলির ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর দ্য অর্থোপেডিক্যালি হ্যান্ডিক্যাপড (বি· টি· রোড কলকাতা-৯০) ক্যাম্পাসের মধ্যেই প্রতি রাজ্যের কোটা অনুসারে মেরিট লিস্ট তৈরি করা হয়। শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং ইন্টারভিউয়ের ফলাফল দেখে প্রার্থী মনোনয়ন করা হয়। জুন মাস থেকেই কোর্স আরম্ভ হয়। ভর্তি হতে ইচ্ছুক প্রার্থীরা এপ্রিল মাস নাগাদ বিভিন্ন আঞ্চলিক কেন্দ্রে যোগাযোগ করতে পারেন।

ছবি : দেবাশিস দেব

টাকাকড়ি

প্রাক-মৌর্য ভারতের সীমানা অঞ্চলের বিদেশি মুদ্রা

প্রাক-মৌর্য যুগে ভারতীয় উপমহাদেশের সীমানা অঞ্চলে বিদেশি মুদ্রার প্রচলন সম্পর্কে জানিয়েছেন **ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়**

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে ষোলোটি মহাজনপদ বা রাজ্যের আমলে ভারতীয় উপমহাদেশে মুদ্রার প্রচলনের সম্ভাবনার কথা আগেই বলা হয়েছে, যদিও দেশজ টাকার ব্যবহারের নিশ্চিত প্রমাণ খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকের আগে পাওয়া যায় না। সুত্তপিটকের অন্তর্গত অঙ্গুত্তর নিকায়ের সাক্ষ্য অনুযায়ী এই ষোলোটি মহাজনপদের দুটি ছিল গন্ধার (বর্তমানে পাকিস্তানের পেশোয়ার এবং বোধহয় রাওয়ালপিন্ডি অঞ্চলে) এবং কাম্বোজ (হিন্দুকুশের দক্ষিণ-পূর্বে কাবুল-বেগ্রাম অঞ্চল, যা কপিশা নামে বেশি পরিচিত ছিল)। পারস্য দেশের হখামনিশীয় বংশের নৃপতি প্রথম দারয়বৌশের (খ্রিঃপূঃ ৫২২ – ৪৮৬) বেহিস্তুন লেখতে তাঁর সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশের তালিকায় আছে প্রথম জনপদটি এবং দ্বিতীয়টি সমেত হারাওবতি (বা আরাকোশিয়া) নামে পরিচিত ভূখণ্ড (যার প্রধান অংশ দক্ষিণ-পূর্ব আফগানিস্তানের কান্দাহার অঞ্চল)। ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম সীমানা অঞ্চলে পারস্য সাম্রাজ্যের অধিকার বিস্তারের প্রচেষ্টা আগে ঘটে থাকলেও দারয়বৌশের সময়ে তা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। গন্ধারের কাছেই ছিল যতগু (বা সত্তগুদিয়) অর্থাৎ খুব সম্ভবত গোমতী বা গোমাল নদীর তীরবর্তী এক জনপদ। এগুলি ছাড়াও ছিল মক (যার সঙ্গে বালুচিস্তানের মাকরান অঞ্চলের সম্পর্কের কথা একেবারে অস্বীকার করা যায় না)। এইসব জনপদের ওপরে দারয়বৌশের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তাঁর রাজত্বের প্রথম দিকেই, অর্থাৎ ৫২২-২১ খ্রিস্টপূর্বাব্দে বা কমপক্ষে বেহিস্তুন লেখর সম্ভাব্য তারিখের আগে (অর্থাৎ খ্রিস্টপূর্ব ৫২০ থেকে ৫১৮-এর মধ্যে)। এর কিছু পরে (আনুমানিক ৫১৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দ নাগাদ)

পারস্য সাম্রাজ্যের সোনার মুদ্রা

সোনা ও রুপার মুদ্রাগুলির মুখ্য দিকে বিভিন্নভাবে মুকুট ও লম্বা পোশাক পরিহিত সম্রাটকে দেখানো হয়েছে, তীরন্দাজের মতো ধনু থেকে তীর ছোঁড়া অথবা ধনুক ও বর্শা সহ দ্রুতগতিতে হাঁটা বা দৌড়নো অবস্থায়।

পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশগুলির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল হিন্দু (বা ইন্ডিয়া) অর্থাৎ নিম্ন সিন্ধুর তীরবর্তী দেশ (মোটামুটিভাবে বর্তমান পাকিস্তানে সিন্ধুপ্রদেশ)।

মিশর ও পশ্চিম এশিয়া থেকে এবং মধ্য এশিয়ার এক অঞ্চল থেকে ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম অংশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল প্রথম দারয়বৌশের বিশাল সাম্রাজ্য। এটি ছিল বিভিন্ন ক্ষত্রপ পদাধিকারী রাজকর্মচারী শাসিত বিভিন্ন প্রদেশে বিভক্ত। খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকের ঐতিহাসিক হেরোডোটাসের মতে গান্ডারদের দেশ (অর্থাৎ গন্ধার) ও সত্তগুদিয় ছিল সপ্তম প্রদেশের অন্তর্গত (যার সীমানার মধ্যে আরও ছিল দদিক ও অপর্যুতদের দেশ)। আর ইন্ডিয়া বা হিন্দু (অর্থাৎ সিন্ধুপ্রদেশ) অঞ্চলকে নিয়ে গঠিত হয়েছিল বিংশতিতম প্রদেশ। বিরাট পারস্য সাম্রাজ্যে চারটি প্রধান রাজধানীতুল্য নগরী ছিল পাসারগাদে (এখনকার ফার্স অঞ্চলে), পার্সিপোলিস, একবাতানো (এখনকার হামাদান অঞ্চলে) এবং সুসা (এখনকার খুজিস্তান এলাকায়)। পার্সিপোলিসের ধ্বংসাবশেষে আবিষ্কৃত কিছু পোড়ামাটির ফলকে উৎকীর্ণ লেখতে দারয়বৌশ শাসিত সুসার সঙ্গে হি-ইন-দু (অর্থাৎ হিন্দু) প্রদেশের শাসনতান্ত্রিক যোগাযোগের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ভারতীয় উপমহাদেশের সীমানাবর্তী অঞ্চলে পারস্য সাম্রাজ্যের অধিকার দ্বিতীয় অর্তক্ষস্‌স (৪০৫-৩৫৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) বা তৃতীয় অর্তক্ষস্‌সর (৩৫৯-৩৩৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) রাজত্বকাল অবধি ছিল। এই দুই রাজার একজনের (সম্ভবত প্রথমজনের) সঙ্গে জড়িত পার্সিপোলিসের এক সৌধে বিভিন্ন প্রদেশের প্রজাদের মূর্তির মাথার ওপরে উৎকীর্ণ লেখমালায় হরউবতি, যতগু, গন্ধার, হিন্দু প্রভৃতি অঞ্চলের অধিবাসীদের উল্লেখ আছে।

আরিয়ানের এক গ্রন্থ থেকে জানা যায়, ইন্ডয়া (অর্থাৎ সিন্ধু অঞ্চল) থেকে আগত একদল সৈন্য ব্যাকট্রিয়ার ক্ষত্রপের অধীনে পারস্যরাজ তৃতীয় দারয়বৌশের (৩৩৬-৩১১ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) পক্ষে আলেকজান্ডারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল (আনাবাসিস, ৩, ৮, ৩-৬)। অবশ্য এরা ভাড়াটে সৈন্য হতে পারে। পারস্য সাম্রাজ্যের পতনের পরে আলেকজান্ডার যখন ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম অংশ আক্রমণ করেন তখন তিনি কয়েকটি ছোট-ছোট রাজনৈতিক শক্তির সম্মুখীন হন, পারস্যের কোনও ক্ষত্রপের সঙ্গে ওখানে তাঁর যুদ্ধ হয়নি। কাজেই মনে হয় যে, হখামনিশীয়দের প্রকৃত কর্তৃত্ব আলোচ্য ভূখণ্ডে দ্বিতীয় বা তৃতীয় অর্তক্ষস্সর সময়ে শেষ হয়ে গিয়েছিল। তা হলেও দীর্ঘকাল যাবৎ ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিমে পারস্য সাম্রাজ্যের কর্তৃত্বের কথা অস্বীকার করা যায় না।

এই কর্তৃত্ব স্থাপনের প্রথম পর্বে যে দুটি ভারতীয় মহাজনপদের স্বাধীনতার বিনাশ ঘটেছিল তাদের মধ্যে একটি গন্ধার এবং অন্যটি নিকটবর্তী কপিশা অঞ্চলের রাজ্য (পরবর্তীকালের রচনা অঙ্গুত্তর নিকায়ে যাকে [পারস্যরাজ কম্বুজ-এর নামাঙ্কিত (?)] কম্বোজ রাজ্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে)। এইসব অঞ্চল সহ বিশাল পারস্য সাম্রাজ্যে প্রথম দারয়বৌশ যেসব শাসনতান্ত্রিক সংস্কার করেন তাদের মধ্যে একটি হল এক নূতন মুদ্রা ব্যবস্থার প্রবর্তন।

সাম্রাজ্যের পশ্চিম অংশে পশ্চিম এশিয়ায় অবশ্য এর আগেই মুদ্রার প্রচলন হয়ে গিয়েছিল। লিডিয়া রাজ্য (এখনকার তুর্কির সীমানাভুক্ত) যখন হখামনিশীয় সম্রাট কুরু দখল করেন খ্রিস্টপূর্ব ৫৪৬ নাগাদ, তখন সেখানে প্রচলিত ছিল রাজা ক্রেসাসের (৫৬১-৫৪৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) সোনার ও রুপার মুদ্রা। মুদ্রা ব্যবস্থার সঙ্গে পরিচিত লিডিয়া প্রভৃতি পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের পারস্য সাম্রাজ্যভুক্তির পর সরকারি মুদ্রার অভাব নিশ্চয় অর্থনৈতিক অস্থিরতার বা অসুবিধার সৃষ্টি করেছিল। পুরনো মুদ্রার ব্যবহার ও সরবরাহের যত ঘাটতি হবে ততই এই অসুবিধা বাড়বার কথা। তাই প্রয়োজন ছিল নূতন সরকারি মুদ্রা ব্যবস্থার প্রবর্তনের। প্রথম দারয়বৌশ এই সুযোগে সমগ্র সাম্রাজ্যের জন্য লিডিয়ারাজ ক্রেসাসের অনুকরণে সোনা ও রুপার মুদ্রার প্রচলন করেন। নিজের নাম অনুযায়ী স্বর্ণমুদ্রার নাম হয়েছিল 'দারিক' এবং ব্যাবিলনীয় শেকেল

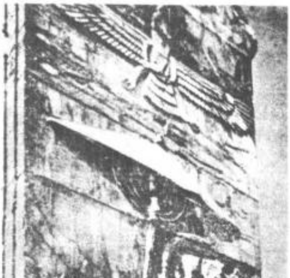

পার্সিপোলিসে আবিষ্কৃত প্রথম দারয়বৌশের পাথরে উৎকীর্ণ মূর্তি

পারস্য সাম্রাজ্যের প্রথম সরকারি মুদ্রা বোধ হয় প্রথমে লিডিয়ার প্রধান শহর সার্ডিসের টাঁকশালে তৈরি হয়েছিল। ৫১৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দ নাগাদ পারস্য সাম্রাজ্যের মুদ্রার প্রবর্তন হয়। এর পর প্রায় দুশো বছরের কাছাকাছি বিভিন্ন সম্রাটের আমলে ওই জাতীয় মুদ্রা তৈরি হয়েছিল। মুদ্রাতে রাজার নাম না থাকায় কোন কোন পারস্যরাজের আমলে টাঁকশাল কর্মব্যস্ত ছিল তা ঠিক জানা যায় না।

ওজনের নাম থেকে নেওয়া হয়েছিল রৌপ্য মুদ্রা সিগলস-এর নাম। নাম দুটি জানা গেছে গ্রিকদের লেখা থেকে। ১২৯·৭ (বা ১৩৩) দ্রাখ্মার দারিক মূল্যে ছিল ২০টি ৮৬·৪ (বা ৮৬·৪৫) গ্রেনের সিগলস (বা ২৫টি এ্যাথেনীয় দ্রখেসসরে) সমান। সোনা ও রুপার আনুপাতিক মূল্য ছিল ১:১৩·৩। সোনা ও রুপার মুদ্রাগুলির মুখ্য দিকে বিভিন্নভাবে মুকুট ও লম্বা পোশাক পরিহিত সম্রাটকে দেখানো হয়েছে, তীরন্দাজের মতো ধনু থেকে তীর ছোঁড়া অথবা ধনুক ও বর্শা সহ দ্রুতগতিতে হাঁটা বা দৌড়নো অবস্থায়। কিছু রুপার মুদ্রায় তাঁর শরীরের ওপরের দিক শোভা পাচ্ছে। সোনা ও রুপার গৌণ দিকে খাঁজ-কাটা। এই খাঁজের মধ্যে অনেক সময়, বিশেষত রুপার মুদ্রাগুলিতে নকশা বা অক্ষরের ছাপ (বা প্রতিছাপ) দেখা যায়। দারয়বৌশ তাঁর মুদ্রার জন্য যে তৌলরীতি গ্রহণ করেছিলেন তার ওপরে সুপরিচিত ব্যাবিলনীয় ওজনরীতির প্রভাব সুস্পষ্ট। লিডিয়ার মতো দ্বিধাতুমানের মুদ্রা ব্যবস্থা গ্রহণ এবং সিগলসের চেহারার সঙ্গে লিডীয় শেকেলের সাদৃশ্য থেকে অনুমান করা যায় যে, পারস্য সাম্রাজ্যের প্রথম সরকারি মুদ্রা বোধ হয় প্রথমে লিডিয়ার প্রধান শহর সার্ডিসের টাঁকশালে তৈরি হয়েছিল। ৫১৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দ নাগাদ পারস্য সাম্রাজ্যের মুদ্রার প্রবর্তন হয়।

এর পর প্রায় দুশো বছরের কাছাকাছি বিভিন্ন সম্রাটের আমলে ওই জাতীয় মুদ্রা তৈরি হয়েছিল। মুদ্রাতে রাজার নাম না থাকায় কোন কোন পারস্যরাজের আমলে টাঁকশাল কর্মব্যস্ত ছিল তা ঠিক জানা যায় না। তবে নানা ধরনের কারণের ভিত্তিতে পন্ডিতরা মুদ্রাগুলির মধ্যে, প্রথম দারয়বৌশ ছাড়াও প্রথম ক্ষয়ার্শ, প্রথম অর্তক্ষস্স, দ্বিতীয় দারয়বৌশ প্রমুখ নৃপতির মুদ্রার সন্ধান পেয়েছেন।

আবিষ্কৃত এই জাতীয় মুদ্রা প্রচুর সংখ্যায় বোধ হয় নিয়মিতভাবে পারস্য সাম্রাজ্যের বিভিন্ন টাঁকশালে তৈরি হত। বিভিন্ন প্রাচীন রচনা থেকে জানা যায় যে, বাজারে এর চাহিদা ছিল যথেষ্ট, আর স্বর্ণমুদ্রাগুলির প্রতি লোভ ইতিহাসের অনেক ঘটনাকে প্রভাবিত করেছিল।

বিনিময় ব্যবস্থায় মুদ্রার ক্রমবর্ধমান প্রাধান্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায় পার্সিপোলিসে আবিষ্কৃত বিভিন্ন সময়ের মজুরির তালিকায়। গোড়ায় পুরো মজুরি দেওয়া হত শস্য ইত্যাদি দ্রব্যের মাধ্যমে। **(ক্রমশ)**

ক্যাম্পাস

কম্পিউটার মেলা

কম্পিউটার নিয়ে ব্যস্ত খুদে প্রোগ্রামাররা *ফোটো : মলয় বন্দ্যোপাধ্যায়*

ওরিয়েন্ট লংম্যান বলতেই এতদিন মনে পড়ত অভিজাত এক বই-প্রকাশন সংস্থার ছবি। পৃথিবীতে এইসব অভিজাত সংস্থাই তাঁদের অধীনস্থ বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে ভাল কাজ করার জন্য এগিয়ে আসেন। টাটা কম্পানি যেমন এগিয়ে আসেন ক্যান্সার রোগ নিয়ে গবেষণার উন্নতিকল্পে বা এম· আর· এফ নামের টায়ার কম্পানি যেমন অহরহ চেষ্টা করে যান ভারতীয় ক্রিকেটের উন্নতির জন্য।

ওরিয়েন্ট লংম্যান কম্পানির অধীনস্থ এক সংস্থা হল অসডাটা। ওঁরা মূলত কম্পিউটারের সফ্টওয়্যার তৈরি করেন। তা বলে, অফিসের কম্পিউটারের জন্য সফ্টওয়্যার নয়, বিভিন্ন 'এডুকেশনাল সফ্টওয়্যার'। স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা যাতে কম্পিউটার নিয়ে খেলাচ্ছলেই জেনে ফেলে পিথাগোরাসের উপপাদ্য কিংবা জটিল সব মজাদার অঙ্কের খেলা। কিংবা একের পর এক অক্ষর এক-একভাবে সাজিয়ে যেন তৈরি করতে পারে নতুন এক-একটি শব্দ।

৪ সেপ্টেম্বর ৪ নম্বর আয়রনসাইড রোডে 'মহাদেবী বিড়লা শিশু বিহার' স্কুলে অনুষ্ঠিত হয়েছিল মজার এক মেলা। নাম

'কম্পিউটার-মেলা'। অভিনব এই মেলার উদ্যোক্তা ছিলেন ওই 'অসডাটা' কম্পানি। শব্দ তৈরি, ঘড়ি দেখতে শেখা, অঙ্ক নিয়ে খেলা, বয়স অনুযায়ী নানা ধরনের সফ্টওয়্যার ব্যবহার করে পাঠ্যবিষয়কে করে তোলা হয়েছিল মজাদার। আর এইসব কম্পিউটারের চালক হিসেবে ছিল আট থেকে চোদ্দ বছর বয়সী একদল নবীন মুখ। সবসুদ্ধু প্রায় এক হাজার ছাত্রছাত্রী এই মেলায় যোগ দিয়েছিল। পাঠ্যপুস্তক মুখস্থ করার বদলে কম্পিউটারের পরদা দেখে পড়াশোনা করতেই এই ছেলেমেয়েরা বেশি উৎসাহী। প্রয়োজনীয় সুযোগ পেলে এইসব ছেলেমেয়েই যে পুরনো শিক্ষাব্যবস্থার বদলে আধুনিকতম শিক্ষাব্যবস্থাকে মনেপ্রাণে বরণ করে নেবে, সে-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

গৌতম চক্রবর্তী

কলকাতার প্রতি ভালবাসা

ফাদার কোভালস্কিকে নিশ্চয় মনে আছে। ডমিনিক লাপিয়ের-এর 'সিটি অব জয়' উপন্যাসের সেই ফাদার কোভালস্কি, রিকশওয়ালা হাসারি পাল ও অন্যান্যদের জীবন উন্নত করার জন্য যিনি হাওড়ার আনন্দনগর বস্তিতে প্রাণপাত পরিশ্রম করেছিলেন।

এহেন ফাদার কোভালস্কি এ এন জেড গ্রিন্ডলেজ ব্যাঙ্কের সাম্প্রতিকতম চিত্রপ্রদর্শনীটি দেখলে নিশ্চয় খুশিতে ভরে উঠতেন।

বস্তির দরিদ্র শিশুদের জীবনে শিক্ষার আলো জ্বালানোর উদ্দেশ্যে এই ব্যাঙ্ক ১৯৬৮ সালে চালু করেছিল বস্তি উন্নয়ন কেন্দ্র।

তারপর তা পরিণত হয়েছে স্কুলে। বস্তি উন্নয়নের স্কুলটি বেশ বড়সড়, প্রায় সাতশোরও বেশি ছাত্রছাত্রী আজ এই স্কুলে পড়াশোনা করে। গ্রিন্ডলেজ ব্যাঙ্ক সম্প্রতি, এই ছেলেমেয়েদের আঁকা নিয়েই এক প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিল তাদের শেক্সপিয়র সরণি শাখায়। শেক্সপিয়র সরণি শাখাতে একটি বেশ উন্নত মানের আর্ট-গ্যালারি আছে, প্রদর্শনীটি সেখানেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

প্রদর্শনীর আঁকাগুলি শুরু হয়েছিল এক 'বসে আঁকো' প্রতিযোগিতার মাধ্যমে। সম্প্রতি সকালে এই অঙ্কন প্রতিযোগিতার বিষয়বস্তু ছিল 'আমি কলকাতাকে ভালবাসি'।

বহুবর্ণ রঙে ও রেখার উজ্জ্বলতায় এই ছেলেমেয়েরা বিভিন্নভাবে বিভিন্ন দিক দিয়ে কলকাতার প্রতি তাদের ভালবাসাকে তুলে ধরেছে অত্যন্ত সুচারুভাবে।

এই আঁকাগুলির মধ্যে থেকে ত্রিশটি ছবি বেছে নিয়েই শুরু হয়েছিল এই প্রদর্শনী। কলকাতাকে ভালবাসার প্রদর্শনী। চলেছিল প্রায় এক পক্ষ কাল।

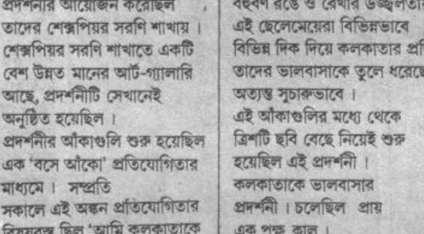

মড়াত
একটা লাল বাতি···কিছু বুঝতে পারছি না···
তা-ই নয়, তারটা এখানেও এসেছে ।
টিনটিন সারাদিন কি এই করবে ?
এখানেও আর-একটা বাতি !
এবং তৃতীয় একটা···
তিনটি গাছ নিয়ে একটি ত্রিভুজ···
বুঝেছি !
এগুলি ওই প্লেনের পাইলটের জন্য নির্দেশ ! 3 F.r ▽ মানে তিনটি লাল আলোর ত্রিভুজ । একটা সঙ্কেত !
তখন···
আর সবচেয়ে খারাপ ব্যাপার এটাই যে, আজ রাত্তিরে আর-একটা প্লেন জিনিস নিয়ে আসবে । আলো না থাকলে জিনিস না নামিয়ে সেটা ফিরে যাবে । আমার টাকায় টান পড়েছে···
আমাদের ফিরতেই হবে, ইভান । প্ল্যানটা শোনো । অন্ধকার হলে আমরা মাঠে গিয়ে আলোর সঙ্কেত দেখাব । প্লেন থেকে জিনিস ফেললে তা গাড়িতে তুলব । কাল সকালের আগেই আমরা পালাব । তুমি কী বলো ?
খাসা মতলব, চিফ ।
সেই রাতে···
সর্বনাশ ! তার টেনে তোলা হয়েছে । আমাদের সাঙ্কেতিক ব্যবস্থা কেউ জেনে ফেলেছে ।
ওই দেখুন, চিফ ! সাঙ্কেতিক আলো জ্বলছে !

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

ব্যাট ম্যান
এক ছেলেভুলনো ছড়ার সূত্রে অভিযানে গিয়ে ব্যাটম্যান আর রবিন 'কুটিল মানুষ'-এর হাতে 'কুটিল বাড়ি'তে বন্দি…
আশ্চর্য ! পাগল হয়ে যাচ্ছি নাকি ? কারণ, সিলিংয়ে দাঁড়িয়ে আমরা ওপরে মেজের দিকে তাকিয়ে আছি !
দ দ্যাখো !
কুটিল মানুষের গ্যাসের ফল… ওর জন্যই গোলমাল ! ব্যাটম্যান, আমাকে ধরো ! আমি ওপরে মেজেতে উঠব !
রবিন, যা-ই করো না কেন, মাথাটা ঠাণ্ডা রেখো !
এই ঘরে গোলমেলে কিছু ব্যাপার আছে ! আমার কাঁধে দাঁড়িয়ে ওপরে ঝোলানো একটা চেয়ার ধরো !
আচ্ছা ? ধরছি…
চেয়ার সাঁটা ! মেজে থেকে খুলে আনা যাবে না !
ঠিক যা ভেবেছি ! আরও জোরে টানো !
অবাক কাণ্ড ! মেজেতে পেরেক দিয়ে আটকানো !
মেজে নয়, রবিন, ওটা সিলিং… আমরা মেজেতে দাঁড়িয়ে আছি ! বুঝতে পারছ না ? সব আসবাব সিলিংয়ে পেরেক বা আঠা দিয়ে সাঁটা ! মনে হচ্ছে ঘরটা উলটে আছে !
ওহ্… ওহ্ !
আবার কী হল ?
"এক যে ছিল কুটিল মানুষ কুটিল পথে হেঁটে ! কুড়িয়ে পেল কুটিল সিকি কুটিল সিঁড়ি ঘেঁটে ! কুটিল বেড়াল কিনল সে এক সেই সিকিটি দিয়ে ! বেড়াল ধরল কুটিল ইঁদুর এবং তিনে মিলে ! রইল তারা মনের সুখে কুটিল বাড়ি নিয়ে"… ব্যাটম্যান, ছড়া শেষ, বুদ্ধির লড়াইও !
কুটিল মানুষ !
তোমার হার, আমার জয়…জয়ীর পুরস্কার গুপ্তধন ! কুটিল সিকির গায়ের আঁচড় আমার চাবি ! দ্যাখো ! দু'খানা ইটের ওপরে… তিনখানা ইটের নীচে…
বাহ্ ! ইটটি সরাও… আর এবার…
…গুপ্তধন ! প্রাচীন এক ইংরেজ নাইটের তলোয়ার… দুর্লভ মণিমুক্তোয় হাতল মোড়া ! এটা এখন আমার ! জোসেফ, কটা বাজে ?
ঠিক দশটা !
তা হলে খেলা শেষ ! আর সেই সঙ্গে তোমারও শেষ, ব্যাটম্যান !
ওহ্ !
ব্যাটম্যান ! ব্যাটম্যান !

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

ধারাবাহিক উপন্যাস

সোনার গণপতি হিরের চোখ

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

পঙ্খী বলল, "দেখছিস কী ! তোর চোখ দুটোকে আমি ভয় করি না। আমাদের বন্ধু দলের একটি মেয়েকে তোদের বুনো চুরি করে এনেছে। এই পাহাড়েরই কোনও গুহাতে লুকিয়ে রেখেছে তাকে। তুই শিগগির আমাদের সঙ্গে গিয়ে তাকে বের করে দিবি চল। না হলে এখান থেকে শুধু হাতে যদি আমাদের ফিরতে হয় তা হলে আগে আমরা বুনোর ঘরে আগুন লাগাব, তারপর তোদের ঘরে। শুধু তাই নয়, কাল সকাল হলেই ঝাড়গ্রাম থেকে পুলিশ আনিয়ে ধরিয়ে দেব তোদের।"

পঙ্খীর কথায় অত্যন্ত রেগে গেল বিশাল। বলল, "পুলিশ এনে তোরা আমাদের ধরিয়ে দিবি ? তারপর কি ভেবেছিস আমরা তোদের ছেড়ে দেব ? গোটা ঠাকরুনপাহাড়িকে জ্বালিয়ে দেব আমরা, তা জানিস ?"

দলের একটি ছেলে তখন একটি পাথর কুড়িয়ে পটাং করে ছুঁড়ে মারল বিশালের কপাল লক্ষ্য করে। এক ঢিলেই কাত। রক্তের ধারা ঝরঝর করে ঝরে পড়তেই রুমালে কপাল চেপে পাথরের ওপর ঝুপ করে বসে পড়ল বিশাল।

চম্পক তখন ঝাঁপিয়ে পড়ল সেই ছেলেটির ওপর।

তাই দেখে পঙ্খীও ছুটে গেল "তবে রে " বলে।

চম্পক একটা লাথি মারল পঙ্খীকে। পঙ্খী ছিটকে পড়ল।

ছেলের দল তখন বীর বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়ল চম্পকের ওপর। হাতের কাছে যা পেল তাই দিয়ে মারতে লাগল চম্পককে। ক্রুদ্ধ কুকুরগুলোর চিৎকারে তখন চারদিক মুখর হয়ে উঠল। বিশাল কোনওরকমে উঠে দাঁড়িয়েই রিভলভার তাগ করল ওদের দিকে।

সেই মুহূর্তে শুভঙ্করের হাতেও রিভলভার এসে গেছে। শুভঙ্কর একটুও দেরি না করে ট্রিগার টিপল, "ডিসুম।"

বিশালের দেহ লুটিয়ে পড়ল পাথরের বুকে।

এই অপ্রত্যাশিত ব্যাপারে হতচকিত সবাই।

শুভঙ্কর রিভলভার হাতে ধীরে-ধীরে এগিয়ে গেল চম্পকের দিকে।

চম্পক কাঁপতে-কাঁপতে বলল, "দোহাই তোমাদের, আমাকে মেরো না।"

শুভঙ্কর বলল, "আমাদের বাধা না দিলে মারব না। তবে প্রাণে যদি বাঁচতে চাস, তা হলে এক্ষুনি আমাদের মেয়েটাকে ফিরিয়ে দে।"

"তোমরা কোন মেয়ের কথা বলছ আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না ?"

"বুঝতে পারবি। আগে বল, বুনোটা কোথায় লুকিয়ে আছে ?"

"বুনো নেই।"

শুভঙ্কর এক লাথি মারল ওর পেটে।

চম্পকের মুখ দিয়ে "কোঁক" করে একটা শব্দ বের হল। তারপর অতিকষ্টে বলল, "সত্যি বলছি বুনো নেই। তবে তোমরা চলো। আমি তোমাদের বন্দী গুহায় নিয়ে যাচ্ছি। সেখানে গিয়ে তোমরা তোমাদের মেয়েকে চিনে নেবে।"

ওরা তখন চম্পককে সঙ্গে নিয়ে ধীরে-ধীরে এগোতে লাগল। চম্পক চলল সকলের আগে। তার পেছনে বিল্টু, তিন্নি ও শুভঙ্কর। ছেলের দলও চলল হইহই করে। এমনকী কুকুরগুলোও ওদের সঙ্গ ছাড়ল না।

এদিকে রিভলভারের শব্দে ও হইহল্লা শুনে পাহাড়ের অন্য একটি উঁচু জায়গা থেকে চোখে বাইনোকুলার লাগিয়ে ওদের সবাইকে বেশ ভালভাবে লক্ষ করতে লাগল শিকারিবাজ। এই অবেলায় দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে দলবদ্ধ ছেলেদের সঙ্গে বিল্টু, তিন্নি ও শুভঙ্করকে দেখেই তো চোখ কপালে উঠে গেল তার। তার ওপর চম্পকের ওই শোচনীয় অবস্থা ভাবিয়ে তুলল ওকে। শিকারি কল্পনাও করেনি কখনও ওদের এই গোপন ঘাঁটিতে এইভাবে কেউ আসতে পারবে বা নিরীহ গ্রামবাসীদের এই ছেলেরা বিদ্রোহী হবে বলে। শিকারি একবার ভাবল ওর মেশিনগান দিয়ে এক লহমায় শেষ করে দেয় এই আপদগুলোকে, আবার সে-কাজের পরিণাম চিন্তা করে কাঁপতে লাগল থরথর করে। এই মুহূর্তে কী যে করবে তা ভেবে পেল না শিকারিবাজ। সে বুঝতে পারল ছেলেমেয়েগুলো ক্রমশ এই পাহাড়ের একেবারে দুর্ভেদ্য অংশের দিকেই এগিয়ে আসছে। এবং ওরা এসে পড়লে কোনও কিছুই আর গোপন থাকবে না। উলটে সব লুটপাট হবে। পুলিশ হলে এতক্ষণে গুলি চালাতে সে দ্বিধা করত না। কিন্তু আদিবাসী ছেলেদের গুলি করলে কী যে হতে পারে না তাই ও ভাবতে লাগল। গাছের ডালে হাত-পা বেঁধে জীবন্ত অগ্নিদগ্ধ করাও ওদের পক্ষে অসম্ভব কিছু নয়।

চতুর শিকারিবাজ তাই আর একটুও সময় নষ্ট না করে ছুটে ওর নিজের গুহায় ঢুকে, নেওয়ার মতো যা-যা ছিল, চটপট গুছিয়ে নিল। তারপর একটা মাঝারি সাইজের দেশী ঘোড়ার পিঠে সেগুলো চাপিয়ে নিজেও চেপে বসল। একবার তাকিয়ে দেখল ছেলেগুলোর দিকে। পরে গুহার পেছন দিক দিয়ে অরণ্যের পথে চুপিসারে রওনা দিল।

কিন্তু বিধি বাম। পালাবার পথ কই। সবে একটা বাঁক নিয়েছে এমন সময় যা ও দেখতে পেল তাতে রীতিমত ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেল ওর শরীর দিয়ে। ও দেখল এক ভীষণদর্শন বুনো হাতি। পাগলা কিনা কে জানে? এক দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে আছে। হাতি তো নয়। খ্যাপা গণেশ। চোখ দুটো যেন জ্বলছে। এত বড় হাতি সচরাচর দেখা যায় না। পাহাড়ের ওপর পাহাড় যেন।

হাতিটা ওকে দেখা মাত্রই পিষে ফেলার জন্য দু' পায়ে ভর দিয়ে দু' পা খাড়া করে লাফিয়ে উঠল।

আর অনভিজ্ঞ মূর্খ শিকারি করল কি, বোকার মতো ওকে একটা গুলি করে বসল। তাও সে গুলিটা আবার কপালে না লেগে লাগল কানে। ক্ষিপ্ত বুনো হাতির তখন সে কী প্রচণ্ড গর্জন।

বিল্টু, তিন্নি, শুভঙ্কর এবং সেই আদিবাসী ছেলের দল সবাই চমকে উঠল হাতির ডাকে।

পক্ষী এই আর্ত গর্জনের অর্থ বোঝে। তাই সে চিৎকার করে উঠল, "পালাও পালাও। পালাও সব। যে যেখানে আছ, পালাও। বুনো গণেশ খেপেছে। পালাও শিগগির।"

নিমেষে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল সব। প্রাণভয়ে প্রথমেই দৌড়ল কুকুরগুলো। তারপরে ছেলের দল। দারুণ ভয়ে ভীত হয়ে পালাল ওরা।

চম্পকও তখন হাতির ভয়ে কাঁপছে কিন্তু গুলির ভয়ে পালাতে পারছে না। সে ভয়ে-ভয়েই বলল, "তোমরা রয়ে গেলে যে! পাগলা হাতির ডাক শুনতে পাচ্ছ না?"

শুভঙ্কর বলল, "পাচ্ছি তো। কিন্তু আমরা আমাদের মেয়েটিকে না নিয়ে ফিরছি না।"

"এর মধ্যে ওই হাতিটা এসে পড়লে রক্ষে রাখবে না কিন্তু। এখনও সময় আছে, পালাও।"

"আমাদের মেয়েটা কোথায়?"

"ওই যে, গুহার ভেতরে। কিন্তু তোমরা ওখানে যাবে কী করে?"

"যেভাবে তুমি আমাদের নিয়ে যাবে সেইভাবেই যাব।"

"কিন্তু পাগলা হাতিটা ওই দিক থেকেই ডাকছে যে?"

আঁকিবুকি — **রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়**

মিলিয়ে নিও

এবারে আঁকার পাতায় দ্যাখো কিসের আভাস ফুটে উঠেছে। আমি কোনও ইঙ্গিত দিলাম না। তোমরাও মনে-মনে ভেবে নাও কী আঁকতে চাইছি আমি। পরে তোমাদের ভাবনা মিলল কি না দেখে নিও।

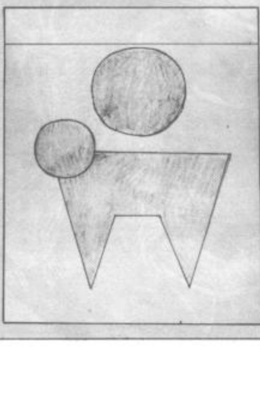

হাসিখুশি — **শতদল**

রাজু তার বাবাকে বলছে, "বাবা, তুমি আমাকে প্রতিদিন একটা করে ভাল কাজ করতে বলেছ। আজ আমি সক্কালবেলা উঠেই একটা ভাল কাজ করেছি। পাশের বাড়ির কাকুর অফিস যেতে দেরি হয়ে গিয়েছিল, তাই উনি বাস ধরবার জন্য তাড়াতাড়ি হাঁটছিলেন, আমি আমাদের ভুলো কুকুরকে ওঁর পেছনে লেলিয়ে দিয়েছি যাতে উনি আরও তাড়াতাড়ি যেতে পারেন।

বাবু: তোমাকে দেখলেই আমার টুটুর কথা মনে পড়ে।
রবি: কিন্তু আমার সঙ্গে তো টুটুর চেহারার কোনওই মিল নেই।
বাবু: তোমরা দু'জনেই আমার কাছ থেকে দশ টাকা ধার নিয়েছ কিনা!

ছবি: দেবাশিস দেব

"ডাকুক না। মেয়েটাকে আমাদের চাই।"
"তা হলে চটপট এসো।"
ওরা দ্রুত এগিয়ে চলল চম্পকের সঙ্গে।

এদিকে আহত হাতিটা তখন ভীষণ গর্জন করে ভয়ঙ্কর ক্রোধে প্রতিশোধের স্পৃহা নিয়ে রণমূর্তিতে ছুটে এল শিকারির দিকে। প্রাণভয়ে ভীত শিকারি কোথায় যে লুকোবে কিছু ঠিক করতে না পেরে ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফিয়ে পড়েই যে পথে এসেছিল সেই পথে ছুটে চলল। ঘোড়াটাও প্রচণ্ড ভয়ে চিঁহিহিহি করে ডেকে উঠতেই হাতিটা তাকে শুঁড়ে জড়িয়ে মারল এক আছাড়। ঘোড়াটা সবসুদ্ধু উলটে পড়ল পাহাড়ের খাদে। সোনাদানা টাকার বাণ্ডিল ছত্রাকার হয়ে গেল সব।

আর শিকারিবাজ? বুনো গণেশের তাড়া খেয়ে দিশেহারা হয়ে ছুটতে গিয়ে হঠাৎ সে এমন একটা জায়গায় গিয়ে পড়ল যেখানে তার পালাবার মতো আর কোনও পথ নেই। সে পেছন দিক থেকে পাহাড়ের দেওয়াল আঁকড়ে মুখ বিকৃত করে তার যমকে দেখতে লাগল। উঃ, কী সাঙ্ঘাতিক। ওই আসছে— ওই এল — আরও— আরও কাছে। সোনার গণপতির হিরের চোখ নয়, জীবন্ত গণপতির জ্বলন্ত চোখ। শুঁড় উঁচিয়ে সগর্জনে বিশাল দুটি দাঁত নিয়ে ছুটে আসছে ওর দিকে। এই মুহূর্তে ওকে শেষ করে দিল বুঝি! না, এইভাবে ওই দানবের পায়ে পিষে মরার চেয়ে অন্য মৃত্যু বরং ভাল। তাই খ্যাপা গণেশ ওর আরও কাছে আসার আগেই ও চোখ বুজে পাহাড় থেকে লাফিয়ে পড়ল পাশের খাদে। ওর অন্তিম আর্তনাদের ধ্বনি, প্রতিধ্বনি হয়ে ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে।

ইতিমধ্যে জঙ্গলের চারদিক থেকে দলে-দলে হাতি বেরিয়ে আসতে লাগল হুড়মুড় করে। বুনো হাতির এই দলটি দূরের কোনও বনভূমি থেকেই সম্ভবত পথভ্রষ্ট হয়ে এসে পড়েছে এখানে।

বিল্টু, তিন্নি ও শুভঙ্কর তখন চম্পককে নিয়ে গুহার একেবারে কাছাকাছি।

ওদিকে ঠাকরুনপাহাড়ের মাথায় গুইরামও তার দলবল নিয়ে হাজির। কত আদিবাসী যে জড়ো হয়েছে তার যেন ঠিক নেই। গুইরাম সেখান থেকেই চিৎকার করে বলল, "খোকাবাবুরা, তোমরা এ কী করছ! পালিয়ে এসো শিগগির। বুনো হাতিকে বিশ্বাস নেই। ওরা তোমাদের দেখলেই তাড়া করবে। পিষে ফেলবে একেবারে।"

বিল্টুরা হাত নেড়ে জানাল, আমরা এখনও নিরাপদ আছি বা আমরা প্রাণের মায়া ত্যাগ করেছি।

চারদিক থেকে তখন টিন, ক্যানেস্তারা ইত্যাদি বাজানো হচ্ছে ঢকঢক করে। এ-অঞ্চলের প্রথাই এই, বুনো শূকর বা হাতির দল এসে পড়লে এইভাবে শব্দ করা হয়। সেই শব্দের চোটে তখন কান পাতা দায়।

বিল্টুরা গুহার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই চম্পক বলল, "এই সেই গুহা।"

ওরা দেখল একটা বড় আকারের গুহার নীচ থেকে ওপর পর্যন্ত বড়-বড় পাথর এমনভাবে সাজানো যে, কোনও জন্তুজানোয়ারের পক্ষেই সেই গুহার ভেতরে ঢুকে পড়া সম্ভব নয়। বানর, হনুমান বা সরীসৃপ জাতীয় কিছুর কথা আলাদা। গুহার উপরিভাগে সামান্য একটু ফাঁক। সেই দিক দিয়েই ঢুকতে হবে ও বেরোতে হবে।

শুভঙ্কর বলল, "আমরা এর ভেতরে ঢুকব কী করে?"

চম্পক তাড়াতাড়ি একটি গাছের ডালের সঙ্গে বেঁধে রাখা দড়ির মইটা ঝুলিয়ে দিল ওদের দিকে, "তাড়াতাড়ি করো।"

ওরা তিনজনই এক জোটে ওপরে ওঠা শুরু করল। শুভঙ্কর উঠেই তিন্নির হাত ধরল। তারপরে বিল্টুর।

চম্পকও তখন ওঠা শুরু করেছে। তবে তাকে আর বেশি উঠতে হল না। সবে খানিকটা উঠেছে, এমন সময় সেই আহত মত্ত হাতিরা ছুটে এসে শুঁড়ে করে জড়িয়ে ধরল ওকে। ধরেই এক আছাড়। তারপর পায়ে করে দলে পিষে একদম শেষ করে দিল। দিয়েই শুরু করল আবার প্রচণ্ড চিৎকার।

শুভঙ্কর দড়ির মইটা গুটিয়ে নিয়ে ভেতরদিকে ঝুলিয়ে দিল। এখন মউকে উদ্ধার করতে হবে, সেইসঙ্গে আত্মরক্ষাও। সারারাত

এখানে থেকে ভোরবেলা রওনা দেবে সকলে। না হলে এখন এই হাতির উপদ্রব এবং রাতের অন্ধকার দুই-ই ওদের পক্ষে বিপজ্জনক। শুধু একটা হাতি তো নয়, হাতির একটা দল খেপে গিয়ে ছুটোছুটি করছে চারদিকে।

ওরা এক-এক করে মই বেয়ে গুহার ভেতরে নেমে মউকে খুঁজতে লাগল। গুহাটি বেশ প্রশস্ত। এক কোণে ছোট্ট একটি চিমনি লণ্ঠন টিমটিম করে জ্বলছে। তারই আলোয় ওরা দেখল কয়েকটি অসহায় ছেলেমেয়ে লোহার চেন দিয়ে হাত-পা-বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে। নানা বয়সের ছেলেমেয়ে সব। কিন্তু না। তাদের ভেতরে আসলজনই নেই। অর্থাৎ কিনা যার জন্য এখানে আসা সেই মউকেই দেখা গেল না তাদের ভেতর।

তিন্নি দু' হাতে মুখ ঢেকে ডুকরে কেঁদে উঠল এবার।

বিল্টু ওর চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বলল, "কেঁদে কী করবি বল? আমরা তো চেষ্টার কোনও ত্রুটি রাখিনি। যার কপালে যা আছে তা তো হবেই।"

শুভঙ্কর বলল, "এত কষ্ট করে, জীবন বিপন্ন করে এখানে এসে এই ফল? ঠিক আছে, এই যদি হয় তা হলে মানস-কৈলাসের রাবণ হ্রদে নয়, ওই সোনার গণপতিকে আমি পেঁকো পুকুরে ছুঁড়ে ফেলব।"

বিল্টু একবার তাকিয়ে দেখল শুভঙ্করকে। সেই দেখার মধ্যে কী ভাব ফুটে উঠল তা ঠিক বোঝা গেল না।

এদিকে লৌহ-শৃঙ্খলে বন্দিনী মেয়েরা এবং ছেলেরা কাতর কণ্ঠে ওদের বলতে লাগল, "তোমরা কারা ভাই? এখানে কী করে এলে? খিদেয়-তেষ্টায় ছটফট করছি আমরা। আমাদের এই শিকলগুলো দয়া করে কেটে দাও।"

(ক্রমশ)

ছবি সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

মুসোলিনির রোম দখল

মরচে-পড়া বন্দুক আর কোদাল নিয়ে রোম শহর দখল করেছিল মুসোলিনির ফ্যাসিস্টবাহিনী। কীভাবে?

দিনটা ছিল ১৯২২ সালের ৩০ অক্টোবর। ইতালির ফ্যাসিস্ট পার্টির পঞ্চাশ হাজারেরও বেশি সদস্য মিছিল করে এগিয়ে যাচ্ছিল রাজধানী রোম শহরের দিকে। পার্টির নেতা, উনচল্লিশ বছর বয়স্ক বেনিতো মুসোলিনি সেদিন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেশের দায়ভার গ্রহণ করছেন। এই নতুন ফ্যাসিস্ট পার্টির বয়স তখন বড়জোর এক বছর।

সেই শুভদিনটির জন্যই মুসোলিনি অপেক্ষা করছিলেন। সারাজীবন ধরে নিজেকে তিনি প্রস্তুত করেছেন এই দিনটির জন্য। তাঁর বাবা পেশায় ছিলেন একজন কর্মকার, কিন্তু বিদ্রোহের চেতনা তাঁর শিরায়-শিরায় প্রবাহিত।

মুসোলিনিও জীবন শুরু করেছিলেন সোশ্যালিস্ট হিসেবে। উনিশ বছর বয়সে ইতালির রাষ্ট্রক্ষমতাকে অস্বীকার করে তিনি পালিয়ে যান উত্তরে, সুইজারল্যান্ডের দিকে। কিন্তু সুইজারল্যান্ডেও তিনি টিকতে পারলেন না। তাঁর মুক্ত চিন্তাধারা ও কার্যকলাপের জন্য এখানকার ক্ষমতাসীন ব্যক্তিরাও ক্রমশ তাঁর কাছ থেকে নিজেদের সরিয়ে নিলেন। ১৯০৪ সালে ইতালিতে ফিরে এলেন মুসোলিনি। এবার শুরু হল তাঁর লেখার জীবন। সোশ্যালিজমের সমর্থনে লিখে চললেন একের পর এক প্রবন্ধ, সম্পাদকীয় মন্তব্য। ১৯১২ সালে ইতালির সোশ্যালিস্ট দৈনিক 'অবন্তি'র সম্পাদক হলেন তিনি। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে মুসোলিনি হঠাৎ নিজেই এক সিদ্ধান্ত নিয়ে বসলেন। দলীয় নীতি বা কার্যক্রম না মেনে তিনি দেশকে মিত্রপক্ষের সমর্থনে যুদ্ধে যোগ দিতে আহ্বান জানালেন। সোশ্যালিস্ট পার্টি কিন্তু সেবার যুদ্ধ সম্পর্কে নিরপেক্ষ ছিল, কোনও পক্ষকেই তারা সমর্থন জানায়নি। পার্টি লাইন থেকে এভাবে বিচ্যুত হওয়ার ফলে মুসোলিনির চাকরিটি চলে গেল, তিনি নিজেই এবার 'ইল পোপোলে ডি ইতালিয়া' নামে এক সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠা করলেন। যুদ্ধে যোগ দিলেন সক্রিয়ভাবে।

সোশ্যালিজমের প্রতি তিনি এখন বীতশ্রদ্ধ। ১৯২১ সালে নিজের কয়েকজন সঙ্গীসাথী, বিশ্বস্ত অনুগামীদের নিয়ে গঠন করলেন ফ্যাসিস্ট পার্টি। ইতালির সব শহরেই এবার ফ্যাসিস্ট দল তৈরি হতে লাগল, তাদের একমাত্র কাজ যেন-তেন-প্রকারেণ বামপন্থীদের হেনস্থা করা।

১৯২২ সালের অক্টোবর মাসের মধ্যেই দেশের অবস্থাটাকে সুচতুরভাবে কাজে লাগালেন মুসোলিনি। রাষ্ট্রক্ষমতায় অভিষিক্ত দুর্বল এক সরকার, বেকারত্ব ও মূল্যবৃদ্ধি বাড়ছে চড়চড় করে, সর্বত্র অশান্ত উত্তেজনা—এই সব কিছুকে দক্ষভাবে কাজে লাগালেন মুসোলিনি। ফ্যাসিস্টরাই যে এবার ক্ষমতায় আসছে তা নিয়ে তখন কারও কোনও সংশয় নেই। মিলান শহরে ইল দুচে (মুসোলিনির উপাধি) একটি খেলায় অংশ নিতে গিয়েছিলেন, তিন লক্ষ ফ্যাসিস্ট ক্যাডার ঝাঁকে-ঝাঁকে এসে দখল করে নিল গোটা শহর। অবরোধ করল রেললাইন, সরকারি অফিস ও বাড়িগুলি পর্যন্ত চলে এল তাদের হাতে। অস্ত্রের অভাব, ক্যাডাররা দখল করে নিল অস্ত্রশস্ত্রের জাদুঘর। গোলন্দাজ বাহিনীর হালকা বন্দুক, জন্তু-জানোয়ার শিকার করার জন্য পুরনো আমলের মরচে-পড়া বন্দুক, বারুদ ভরা প্রাচীন রাইফেল এ-সমস্ত পুরনো অস্ত্র দখল করেই ফ্যাসিস্টদের উৎসাহ তখন আর বাঁধ মানছে না। মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। তার মধ্যেই এসব জীর্ণ অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তারা এগিয়ে গেল রাজধানী রোম শহরের দিকে। রাজধানীও এবার তারা দখলে আনতে চায়। পয়সাওয়ালা এক অভিজাত ফ্যাসিস্ট সভ্যের একটা ফিয়াট স্পোর্টস কার ছিল, সেই গাড়ির ছাদে মেশিনগান ফিট করে সে ঢুকে পড়ল রোম শহরে। অন্যরা বাগান করার কোদাল, শাবল, খন্তা, টেবিলের ভাঙা পায়া, হাতের কাছে যা পেল তা নিয়ে উঠে এল শহরের প্রান্তে পাথরের সেতুগুলিতে। নুনমাখানো শুকনো শক্ত বাকালা মাছ নিয়ে আর একদল তৈরি হয়ে থাকল সৈন্যদলের মোকাবিলা করার জন্য। শেষ অবধি এতসব কিছুই হল না। ফ্যাসিবাদের এই জোয়ারে আত্মসমর্পণ করলেন সম্রাট ভিক্টর এমানুয়েল। মন্ত্রিসভা গঠন করতে আহ্বান জানালেন মুসোলিনিকে। ট্রেনে আসতে-আসতেই পোশাক বদলে মুসোলিনি পরে নিলেন একটি কালো জামা, ট্রাউজার্স ও বউলার হ্যাট। সেই পোশাকেই সম্রাটের সামনে উপস্থিত হয়ে তিনি বললেন, 'সম্রাট নিশ্চয় আমার এই পোশাক ক্ষমা করবেন। আমি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরাসরি এখানে এসেছি।' ইতালিতে তেইশ বছরব্যাপী ফ্যাসিজমের রাজত্ব সেদিনই শুরু হল।

প্রশ্ন

নিল ও'ব্রায়েন

(১) রানা প্রতাপের ঘোড়ার নাম ছিল 'চেতক'। 'বুসিফেলাস' কার ঘোড়ার নাম ? **অতনু ও অমিত হালদার**, বর্ধমান।
(২) একটি গলফ বলের ওজন কত ? **রঞ্জন চক্রবর্তী**, ঝাঁপানডাঙা পরেশনাথ বিদ্যামন্দির।
(৩) কোন নাটক দেখার সময়ে আব্রাহাম লিঙ্কনকে হত্যা করা হয়েছিল ? **আফজল হোসেন**, বীরভূম।
(৪) 'দ্য মিথ অব সিসিফাস' নামক বইটির রচয়িতা জন্মসূত্রে আলজিরিয়ার মানুষ, লিখতেন ফরাসি ভাষায়। তাঁর নাম কী ? **মানবেন্দ্রনাথ ঘোষ**, আলিপুরদুয়ার।
(৫) পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম দেশ কোনটি ? **শিবানী ভট্ট**, বহরমপুর।
(৬) এশিয়ার বৃহত্তম রেলসংস্থা কোন দেশের ? **অনন্তকুমার মাহাতো**, কুমুদকুমারী ইনস্টিটিউশন, ঝাড়গ্রাম।
(৭) কর্সিকা, এলবা ও সেন্ট হেলেনা, এই তিনটি দ্বীপের মধ্যে মিল কোথায় ? **মহম্মদ কানন হোসেন**, বীরভূম।
(৮) সবচেয়ে কম বয়সে টেস্ট ক্রিকেটে কে সেঞ্চুরি করেছেন ? **মহব্বত হোসেন**, বীরভূম।
(৯) শকুনির পুত্রের নাম কী ? **রাজীব চক্রবর্তী**, জামশেদপুর।
(১০) পরবর্তী ওলিম্পিকের ম্যাসকটের নাম কী ? **সায়ন্তনী দাস**, বেহালা।
(১১) কোন অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটারকে তাঁর সহখেলোয়াড়রা 'ড্রব' নামে ডাকেন ? **দেবব্রত দত্ত**, পুরুলিয়া।
(১২) 'রাগ অনুরাগ' বইটি কার জীবনী ? **সর্বেশ্বর ঘোষ ও দোলনচাঁপা দত্ত**, কান্দি।
(১৩) কোন পরিবারে বাবা ও ছেলে দু'জনেই রঞ্জি ট্রোফিতে সেঞ্চুরি করেছেন ? **অনিমেষ চ্যাটার্জি**, কলকাতা-১০।
(১৪) ১৯৯০ সালের নববর্ষে, ভারতীয় দূরদর্শনে প্রথম কোন বিজ্ঞাপনটি দেখানো হয়েছিল ? **অনন্যা রায়, ঋতুপর্ণা রায়**, বিধাননগর।
(১৫) ১৯৯০ সালের এপ্রিল মাসে জাপানের মিৎসুই ও টাইয়ো কোব, এই ব্যাঙ্ক দুটি একত্রিত হয়ে নতুন এক ব্যাঙ্ক গঠন করেছে। আর্থিক আমানতের দিক থেকে এটি এখন পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম ব্যাঙ্ক। বৃহত্তম কোনটি ? **সুশীলকুমার পোদ্দার**, কলকাতা-২৯।
(১৬) শার্লক হোমসের সহকারীর নাম ডাঃ জন-এইচ-ওয়াটসন। 'এইচ' শব্দ দিয়ে মাঝের নামটি কী ছিল ? **বিশ্বরূপ রায়**, কলকাতা-২৮।
(১৭) ভারতের প্রথম স্বয়ংক্রিয় টেলিফোন যন্ত্র কবে, কোথায় স্থাপিত হয়েছিল ? **জয়দীপ গুহঠাকুরতা**, কলকাতা-৫৯।

উত্তর আগামী সংখ্যায়) ✍

গত সংখ্যার উত্তর

(১) জো লুই।
(২) কাউন্ট আলেসান্দ্রো ভোল্টা।
(৩) স্বামী বিবেকানন্দ।
(৪) জাকর্তা।
(৫) টলস্টয়।
(৬) জয়প্রকাশ নারায়ণ।
(৭) ভাস্কর। ১৯৭৯ সালের ৭ জুন এটি মহাকাশে উৎক্ষেপণ করা হয়।
(৮) মিনার্ভা। ১৯৯০ সালের ১১ জানুয়ারি এই নাম হয়েছিল।
(৯) ভগবানদাস গিদওয়ানি।
(১০) প্রেস ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়া।
(১১) সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়।
(১২) মস্কো শহরে।
(১৩) রিচার্ড হ্যাডলি।
(১৪) কিউসু দ্বীপে।
(১৫) দুটি। পুষ্কর ও চিত্রকূটে।
(১৬) জর্জ এলিয়ট।
(১৭) সাইপ্রাস।
(১৮) দুশো বছর।

জো লুই

রিচার্ড হ্যাডলি

স্বামী বিবেকানন্দ

জয়প্রকাশ নারায়ণ

বিষয় : কলকাতায় বিজ্ঞানচর্চা

প্রশ্ন

(১) কার উৎসাহে শিবপুরে বোটানিক্যাল গার্ডেন স্থাপিত হয়েছিল ?
(২) কোন উদ্ভিদবিজ্ঞানী সর্বপ্রথম ভারতীয় উদ্ভিদজগতের বৈজ্ঞানিক শ্রেণীবিভাজন করেছিলেন ?
(৩) কোন বাঙালি মাউন্ট এভারেস্টকে জরিপ করে পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ বলে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন ?
(৪) প্রথমদিকে শিবপুরে সেই কলেজটির নাম ছিল বিশপ্‌স কলেজ । আজ তার নাম কী ?
(৫) কলকাতার এক জায়গায় সার রোনাল্ড রস নিয়মিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে শেষ অবধি আবিষ্কার করেন, অ্যানোফেলিস মশা ম্যালেরিয়া রোগের জীবাণু বহন করে । কোথায় সেই জায়গা ?
(৬) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে প্রথম 'পালিত অধ্যাপক'কে ?
(৭) জাহাজে চেপে তিনি ইংল্যান্ডের দিকে পাড়ি দিয়েছিলেন । যেতে যেতে ভূমধ্যসাগরের ঘন নীল জলের রং তাঁকে মুগ্ধ করেছিল । পরে এই মুগ্ধতা থেকেই বিজ্ঞানের এক যুগান্তকারী আবিষ্কার জন্ম নিয়েছিল । কে এই বিজ্ঞানী ?
(৮) বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস কে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ?
(৯) প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞানচর্চা বিষয়ে প্রথম প্রামাণ্য ইতিহাস-গ্রন্থের নাম 'দ্য হিস্ট্রি অব হিন্দু কেমিস্ট্রি' । কে এই গ্রন্থ রচনা করেছিলেন ?
(১০) বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ ও বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট পরবর্তীকালে একত্রিত হয়ে একটিই প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল । সেই প্রতিষ্ঠানের নাম কী ?
(১১) অ্যান্টিমনি ধাতুসংক্রান্ত একটি যৌগ কালাজ্বরের প্রতিষেধক হিসেবে আবিষ্কৃত হয়েছিল । কোন চিকিৎসক এই আবিষ্কার করেছিলেন ?
(১২) বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ কে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ?
(১৩) এক বাঙালি বিজ্ঞানী পরিসংখ্যান সংক্রান্ত নতুন একটি তথ্য দিয়েছিলেন । আলবার্ট আইনস্টাইন পরবর্তীকালে এই পরিসংখ্যানটি পারমাণবিক তত্ত্বে প্রয়োগ করেছিলেন । কে এই বাঙালি বিজ্ঞানী ?
(১৪) উদ্ভিদদেহে ছোট ছোট চলন ও উদ্দীপনার পরিমাপ করার জন্য এক বাঙালি বিজ্ঞানী দেশি প্রথায় বেশ কিছু যন্ত্র আবিষ্কার করেছিলেন । ক্রেস্কোগ্রাফ সেই সব দেশি যন্ত্রের মধ্যে একটি । এই বাঙালি আবিষ্কারকের নাম কী ?
(১৫) ভারতের প্রথম ব্লাড-ব্যাঙ্ক কে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ?
(১৬) কোন বাঙালী মনোবিজ্ঞানী 'কনসেপ্ট অব অপোজিট উইশ'-এর তত্ত্ব আবিষ্কার করেছিলেন ?
(১৭) কোন বাঙালি পরিসংখ্যানবিদ D^2 পরিসংখ্যান তত্ত্ব প্রচলন করেছিলেন ?
(১৮) তড়িদাহত কণাগুলির পরিচলন নির্দেশ করার জন্য উইলসন ক্লাউড চেম্বার ব্যবহার করা হয় । কলকাতার প্রথম উইলসন ক্লাউড চেম্বার কে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ?
(১৯) 'সত্যেন্দ্রনাথ বোস জাতীয় বিজ্ঞান কেন্দ্র' কলকাতার কোথায় অবস্থিত ?
(২০) বর্তমানে এক মনোবিজ্ঞানী তাঁর 'অন্তরা' ও 'বাউলমন' চিকিৎসালয়ে মাদকাসক্তি সারাতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছেন । কে তিনি ?
(২১) ঠাকুরপুকুর ক্যান্সার রিসার্চ সেন্টার কে প্রতিষ্ঠা করেছেন ?
(২২) এশিয়ায় প্রথম সাইক্লোট্রন যন্ত্র কে বসিয়েছিলেন ?
(২৩) কলকাতার প্রথম মানমন্দির কে চালু করেছিলেন ?
(২৪) কোন বাঙালি প্রত্নতাত্ত্বিক মহেঞ্জোদরোর ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করেছিলেন ?

প্রশ্ন

(ক) ভ্যারিয়েবল সাইক্লোট্রন যন্ত্র । কলকাতার কোথায় এটি আছে ?
(খ) উদ্ভিদের ক্রোমোজোম নিয়ে গবেষণা করে পদ্মভূষণ উপাধিতে সম্মানিত হয়েছেন কলকাতার এই বিজ্ঞানী । এঁর নাম কী ?
(গ) সিউডোমোনাস সেপাসিয়া নামে নতুন প্রজাতির এক জীবাণু আবিষ্কার করেছেন এই বাঙালি বিজ্ঞানী । এঁর নাম কী ?

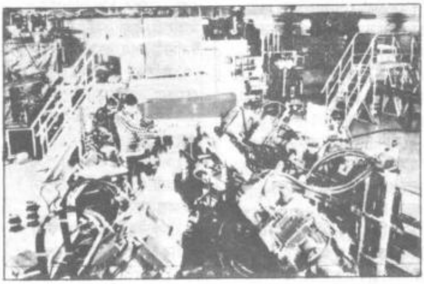
(ক)

(খ)

(গ)

ছবির পরিচয় : (ক) সল্ট লেক । (খ) অর্চনা শর্মা । (গ) আনন্দমোহন চক্রবর্তী ।

উত্তর : (১) রবার্ট কিড । (২) বোটানিক্যাল গার্ডেন্স-এ কিডের পরবর্তী অধ্যক্ষ উইলিয়াম রক্সবার্গ । (৩) রাধানাথ শিকদার । (৪) বেঙ্গল এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ । (৫) বর্তমান এস এস কে এম হাসপাতালের ছোট এক ল্যাবরেটরি । (৬) সি ভি রামন । (৭) সি ভি রামন । তাঁর 'রামন এফেক্ট' আবিষ্কারের পেছনে এই ঘটনা । (৮) আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় । (৯) আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় । (১০) যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় । (১১) ইউ এন ব্রহ্মচারী । (১২) সত্যেন্দ্রনাথ বসু । (১৩) সত্যেন্দ্রনাথ বসু । (১৪) জগদীশচন্দ্র বসু । (১৫) ডঃ ইউ এন ব্রহ্মচারী । (১৬) গিরীন্দ্রশেখর বসু । (১৭) প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ । (১৮) দেবেন্দ্রমোহন বসু । (১৯) বিধাননগর । (২০) শত্রুজিৎ দাশগুপ্ত । (২১) ডঃ সরোজ গুপ্ত । (২২) মেঘনাদ সাহা । (২৩) ডঃ ইউজিন লাঁফো । সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের এক বেলজিয়ান শিক্ষক । (২৪) রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ।

বইয়ের খবর

ভগবানকে লেখা চিঠি

নতুনত্বে ভরা একটি শিশুপাঠ্য বই লিখেছেন ডেভিড হেলার। বইটির নাম 'ডিয়ার গড : হোয়াট রিলিজিয়ন ওয়্যার দ্য ডাইনোসরস ?' নাম শুনে অবশ্য বিষয় খানিকটা আন্দাজ করা যায়। একটি বাচ্চা ছেলে তার মনের নানা প্রশ্ন, অভিজ্ঞতা, চিন্তা, মনস্কামনা অকপটভাবে চিঠিতে লিখছে, যে-চিঠি সে পাঠাচ্ছে স্বয়ং ঈশ্বরকে। ভগবানের কাছ থেকে তার জানার বিষয় বিস্তর, তাকে জানানোর বিষয়ও অগুনতি। যুদ্ধ, সমাজ—এসব বিষয়ে প্রশ্ন ও স্ব-অভিজ্ঞতা যেমন আছে, আছে তার পরিবারের লোকেদের সম্পর্কে তার মতামত, রয়েছে প্রাতরাশে তার কী খেতে ভাল লাগে, ধর্মের বিষয়ে সে কী চিন্তা করেছে ইত্যাদি বহু বিচিত্র কথা। চিঠিগুলি এত মজার ও খোলামেলা ভঙ্গিতে লেখা যে, যে-কোনও পাঠকেরই ভুল হবে, সত্যিই কোনও ছোট ছেলের লেখা এগুলি, ভেবে। অসাধারণ এই বইটি পড়লে অন্য শিশুরাও নিশ্চয়ই বুঝবে তাদের ভাবনাচিন্তার সঙ্গে মিল বা অমিল কতটুকু আছে এই পত্রলেখকের। খুব অমিল যে কিছু হবে না, সে-কথা আমি জোর দিয়ে বলতে পারি। অনেক চিঠি রয়েছে বইটিতে, সবক'টিই সমান চিত্তাকর্ষক। প্রকাশক : ডাবল ডে সংস্থা। দাম : ১০·৯৫ ডলার।

কয়েকটি বই

এ অ্যান্ড সি ব্ল্যাক প্রকাশনা সংস্থা একসঙ্গে বেশ কয়েকটি ছোটদের বই প্রকাশ করেছেন। বিষয়ের দিক থেকে যেমন বৈচিত্র্য রয়েছে আবার বিভিন্ন বয়সের পাঠকের মনোমতো করে বইগুলি সযত্নে ছবি, রঙিন ফোটোগ্রাফ প্রভৃতি দিয়ে ভরিয়ে তুলেছেন তাঁরা। ছোটদের জন্য গল্প, ছড়া, জ্ঞানবিজ্ঞানের কথা, রূপকাহিনী এসব সমেত এক

চমৎকার উপহার। বইগুলির মধ্যে রয়েছে কল্পনা আর শিহরনে ভরা জঙ্গলমানুষের গল্প জারটান বা আজব বেড়ালকে নিয়ে লেখা মাস্টার টমাস ক্যাট। দুটি বইয়েরই লেখক টিম আর্চবল্ড। দাম : ৪·৫০ পাউন্ড। আমুদে ভালুককে নিয়ে লেখা সুসানা গ্রেট্জ-এর দ্য বিয়ারস হু ওয়েন্ট টু দ্য সি সাইড (দাম : ৪·৯৫ পাউন্ড) বা পাজি ডাইনি বুড়িকে নিয়ে লেখা কারি উমানস্কি-র পংউইফি (দাম : ৭·৯৫ পাউন্ড) উল্লেখযোগ্য। স্নিগ্ধ-মধুর আনন্দ-বিষাদভরা নিনাস মেশিন, যার লেখক আলিসন সেজ (দাম : ৩·৯৫ পাউন্ড) এবং হেলেন কুকের লেখা জেসি রানস অ্যাওয়ে নিঃসন্দেহে ভাল লাগবে। এই বইটির দামও ৩·৯৫ পাউন্ড।

বন থেকে ফিরে

এক গ্রামে থাকতেন এক গরিব মহিলা। সে অনেককালের কথা। তাঁর ছিল একমাত্র ছোট্ট মেয়ে— মিলি। দু'জনে সুখে-দুঃখে দিন কাটান। এমন সময় সে-দেশ আক্রমণ করলেন পাশের দেশের রাজা। বেজে উঠল যুদ্ধের বাজনা। মহিলা দেখলেন তাঁর ছোট্ট মেয়ের জীবনসঙ্কট। তিনি তাকে বললেন বাড়ির পাশে, নদী পেরিয়ে বনে পালিয়ে যেতে। বনের মধ্যে মেয়েটি চলতে-চলতে দেখল একটা গাছের তলায় বসে আছেন লম্বা সাদা দাড়িওলা এক ঋষি। তিনি মেয়েটিকে আদর করে আশ্রয় দিলেন। দিনদশেক কেটে গেল। তখন সেই ঋষি মেয়েটিকে অভয় দিলেন, যুদ্ধ থেমে গেছে, এবার বাড়ি ফিরতে পারে মিলি। মায়ের কাছে ফেরার সময় মিলি বুঝল একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে গেছে। মাত্র কয়েকদিনে পালটে গেছে সবকিছু। আসলে ওই ঋষি ছিলেন সেন্ট জোসেফ। কয়েকদিন নয়, মেয়েটি বুঝল সে ফিরেছে তিরিশ বছর পরে। বইটির নাম 'ডিয়ার মিলি'। প্রকাশক ভাইকিং কেস্ট্রেল সংস্থা।

বেড়ালছানার অ্যাডভেঞ্চার

এ এন উইলসনের পাঁচটি সুখপাঠ্য গল্প সঙ্কলিত হয়েছে তাঁর সাম্প্রতিক বই 'ট্যাবিথা'-য়। সবক'টি গল্পেরই নায়ক বেড়ালছানা ট্যাবিথা। তার জীবনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতার কথা সহজ সরল ভাষায় শুনিয়েছেন উইলসন। কোনওটিতে ট্যাবিথা আবিষ্কার করে তাদের বাড়ির পেছনে কুচকুচে কালো রহস্যময় ও ভয়ঙ্কর জন্তুকে। তারপর লুকিয়ে লক্ষ রাখে সেই জন্তুটির পদক্ষেপের ওপর আর সুযোগ খোঁজে তাকে শায়েস্তা করার...। কোনওটিতে তার সঙ্গী ডরিসকে নিয়ে সে বেরিয়ে পড়ে গোপন অভিযানে। ডরিস ট্যাবিথার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু। সে ট্যাবিথার চেয়েও ছোট এক গিনিপিগ।

সঙ্ক ডেভিসের আঁকা ছবিগুলির প্রশংসা করতে হয়। নিউ ইয়র্ক অর্চার্ড বুক কর্তৃক বইটি প্রকাশিত। দাম : ১৫·৯৫ ডলার।

অভীক মজুমদার

ছড়া ও বিজ্ঞান

কলকাতার ছড়াটুন,
অঞ্জনা চক্রবর্তী,
সাংস্কৃতিক খবর,
কলকাতা-৩১,
দাম : ৫ টাকা।

অঞ্জনা চক্রবর্তীর ছড়া আগে পড়িনি। ছিমছাম অফসেটে ছাপা, আকর্ষক প্রচ্ছদ ও বাঁধাই শুরুতেই বইটির প্রতি মনোযোগী করে তোলে। 'আধুনিক রামধনু' পর্যায়ের ছড়াগুলি পাঠকদের বেশ মজা দেবে। কিশোরদের মতো বড়দের কাছে ছড়াগুলি ভাল লাগবে।

নাক কান গলার ব্যাধি ও নিরাময়
ডাঃ দুলাল বসু ও ডাঃ অরুণকুমার দত্ত,
করুণা প্রকাশনী,
কলকাতা-৯
দাম : ২৫ টাকা।

বাংলাভাষায় চিকিৎসা-সংক্রান্ত বই অনেক লেখা হয়েছে। কিন্তু শরীরের বিশেষ কয়েকটি অঙ্গ নিয়ে এমন সহজ সরল বিশ্লেষণ

হয়েছে খুবই কম। দুই চিকিৎসক যে মনোযোগ ও সূক্ষ্ম আন্তরিকতা দিয়ে এই বইটি লিখেছেন, তা পাঠকদের উৎসাহিত করবে। চিকিৎসার জটিলতা এড়ানোর জন্য নাক, কান ও গলার গঠনশৈলী শারীরতত্ত্ব, রোগাবস্থার বিভিন্ন দিক, রোগ নির্ণয় ও তার উপযুক্ত চিকিৎসাপদ্ধতি নিয়ে দুই বিশিষ্ট চিকিৎসক বইটিকে সংগ্রহযোগ্য করেছেন।

শোভন মহাপাত্র

নানারকম

ধাঁধা

"কবে বেরোবে ধাঁধাটা ?" ছোট্‌কা জিজ্ঞেস করল আমাকে। সাধারণত ছোট্‌কা ধাঁধা নিয়েই মাথা ঘামায়। ধাঁধা কবে প্রকাশিত হবে, তা নিয়ে মাথা ঘামায় না। এবারই প্রথম এই ধরনের একটা প্রশ্ন করল। আমার অবশ্য জানাই ছিল তারিখটা। তাই একটুও চিন্তা না করে ছোট্‌কাকে জবাব দিলাম, "চোদ্দই নভেম্বর।" "তা হলে ?" ছোট্‌কা যেন হঠাৎ খুব চিন্তায় পড়ে গেছে উত্তরটা শুনে, এমন গভীর মগ্ন গলায় বলল, "কী করা যাবে সতুবাবু ? শিশু-ধাঁধা কোথায় পাব এখন ?"

"শিশু-ধাঁধা !" আমি বুঝতে পারি না হঠাৎ এমন একটা কথা মাথায় এল কেন ছোট্‌কার, চমকে উঠে বলি, "সে আবার কী ? কেন হঠাৎ এ-কথা বলছ ?"

"হা ঈশ্বর !" ছোট্‌কা এবার গলায় মজার সুর আনল, "১৪ নভেম্বর যে শিশুদিবস, তাও জানো না সতুবাবু ? নেহরুর জন্মদিন না ?"

তাই তো ! এতক্ষণে বুঝলাম, কেন হঠাৎ তারিখ নিয়ে এত মাতামাতি ছোট্‌কার। নিজে ঠিকই জানে, শুধু আমার মনে আছে কি না বাজিয়ে নিতে চাইল। তবে হ্যাঁ, ধাঁধাটা এবার শিশুদের নিয়েই। যদিও শিশুরা এর উত্তর করতে পারবে, না কিশোররা, সন্দেহ আছে।

প্রথম ধাঁধা ॥ তিনটি ছোট্ট ছেলে। পলাশ, শোভন এবং অশোক। ডাকনাম অন্য, ভাল নামটাই বললাম। এরা তিন ভাই। একদিন হল কি, তিন ভাই যখন খেলতে যাচ্ছে, মা তাদের ডেকে বললেন, আমি একটু বেরোচ্ছি। তোরা বাড়ি ফিরে দেখবি, থালার মধ্যে নাড়ু করা থাকবে। সমান তিন ভাগ করে তিনজনে খেয়ে নিবি। তিন ভাইয়ের তিনরকম খেলার সঙ্গী। প্রথমে বাড়ি ফিরল পলাশ। থালায় ক'টা নাড়ু আছে দেখে সে তিন ভাগের একভাগ খেয়ে আবার খেলতে চলে গেল। এর পর এল শোভন। সে তো জানে না, এক ভাই এসে খেয়ে গেছে। সে করল কি, তখন যত নাড়ু ছিল তার তিন ভাগের এক ভাগ খেয়ে চলে গেল। অশোক এল একটু পরে। সে তো আগের দু'জনের আসার কথা জানে না। সে-ও একই কাণ্ড করল। অর্থাৎ তখন যত নাড়ু ছিল থালায়, তার তিন ভাগের এক ভাগ খেয়ে চলে গেল। থালায় তখন পড়ে রইল আটটি নাড়ু। মা বাড়ি ফিরে এসে নাড়ু আটটিকে দেখে বুঝলেন, কিছু একটা গোলমাল হয়েছে। তিন ভাইকে ডেকে সব শুনলেন। তারপর এমনভাবে শোভন আর অশোকের মধ্যে নাড়ু আটটিকে ভাগ করে দিলেন যে, প্রত্যেকের ভাগ সমান হল তখন। কে ক'টা পেল ?

দ্বিতীয় ধাঁধা ॥ কোনও অঙ্ক না কষে চারকে কীভাবে আট করা যায় ?

তৃতীয় ধাঁধা ॥ জট ছাড়াও—
ভাতাবপ্রণব

গতবারের উত্তর ॥ (১) ওই দ্বীপের যে-কোনও অধিবাসীই নিজের পরিচয় দেবে 'বৃক্ষবাসী' হিসেবে। গুহাবাসীরা মিথ্যে করে বলবে তারা বৃক্ষবাসী। আর সত্যবাদী বৃক্ষবাসীরা তো নিজেদের বৃক্ষবাসী বলবেই। তাই ভদ্রলোক যে-মুহূর্তে বললেন যে, ওই দ্বীপের একটি লোক নিজেকে গুহাবাসী বলে পরিচয় দিয়েছে, তখনই বোঝা গেল, ভদ্রলোক নিজেই মিথ্যে গল্প ফেঁদেছেন। (২) বিভা। বিভাবসু মানে সূর্য বা অগ্নি বা চন্দ্র। (৩) ললিতকলা।

সত্যসন্ধ

কত কথা

নতুন, নয়ন, নবীন— তিনটি দু'মুখো শব্দ, অর্থাৎ ওলটালেও একই থাকে। এই শব্দ-তিনটির মধ্যে কোনটা বেমানান ?

২। এবারে আবার সেই এক শব্দের অক্ষর উলটে-পালটে অন্য শব্দ তৈরির খেলা। (ক) বনফুল, (খ) হালফিল, (গ) বাচ্চাকাচ্চা— এই তিনটি শব্দকে উলটে-পালটে অন্য তিন শব্দ বানাও।

৩। সূত্র অনুযায়ী এমন তিনটি ফলের নাম লেখো যার মধ্যে আরও তিনটি ফল পাওয়া যাবে। সে-তিনটি কী-কী সহজেই বের করতে পারবে। সূত্র : (ক) দিশি-বিলিতি দু'রকমই হয়। (খ) কাবুলি মেওয়াবিশেষ। (গ) লেবুবিশেষ।

উত্তর : ১। 'নয়ন' শব্দটি বেমানান, কারণ এটি বিশেষ্য। অন্য দুটি বিশেষণ। ২। (ক) ফুলবন, (খ) ফিলহাল, (গ) কাচ্চাবাচ্চা। ৩। (ক) আমড়া (আম), (খ) আখরোট (আখ), (গ) কমলা (কলা)।

কথক

মজার খেলা

এবারের মজার খেলার জন্য চাই চার প্যাকেট তাস থেকে বেছে-নেওয়া চার-চারে ষোলোটা টেক্কা। আর চাই একটা বড় পিজবোর্ডের ওপর আঁকা ষোলোটা ঘরের একটা ফাঁকা বর্গক্ষেত্র। চার প্যাকেট তাস যদি না থাকে, তা হলে তাসের আকারে মোটা কাগজ কেটে তার ওপর চারটে হরতন, চারটে রুইতন, চারটে চিড়েতন ও চারটে ইশকাপন এঁকে নিয়েও খেলাটা তৈরি করতে পারো। খেলার শুরুতে পিজবোর্ডের ওপর ফাঁকা ঘরগুলোতে সঙ্গের ছবির মতো তাসগুলোকে সাজিয়ে রাখো। চারটে করে একই চিহ্নের তাস তখন পাশাপাশি থাকবে। এইভাবে অনেকটা—

♣	♣	♣	♣
♤	♤	♤	♤
◇	◇	◇	◇
♡	♡	♡	♡

এবার কী করতে হবে বলি। তুমি করবে কি, চাররকমের চিহ্নঅলা এই ষোলোটি তাসকে ষোলোটি ঘরের মধ্যে এমনভাবে ফের সাজাবে যাতে কিনা, কোনাকুনি, পাশাপাশি বা লম্বালম্বি— যেদিক থেকেই দেখা যাক না, সব সময়ই চোখে পড়বে চাররকম চিহ্নের চারটি তাস। শুনে হয়তো ভাবছ, এ আর এমন শক্ত কী কাজ ! কিন্তু কাজটা যে খুব সহজ নয়, তাসগুলো হাতে নিয়ে সাজাতে গেলেই দেখবে। তাই আগেভাগে রপ্ত করে নাও। কীভাবে বসবে তাসগুলো। বসবে এইভাবে—

♤	◇	♣	♡
♡	♣	◇	♤
◇	♤	♡	♣
♣	♡	♤	◇

মজারু

ছবি : দেবাশিস দেব

আর সব ক্রীম ছেড়ে বোরো ক্যালেনডুলাই
বেছে নিলাম কেন? এতো সাদা কথা। পরখ
করলেই বুঝবেন এই টিউবে আছে সেরা
কোয়ালিটি'র ক্রীম। আছে চন্দন আর
ল্যানোলিন—সঙ্গে ক্যালেনডুলার গুণ।
শুকনো ত্বকে যেমন কাজ দেয়, মামুলি কাটা
ছড়াও তেমন চট্‌পট্ সারায়। তাই না
বোঁরো ক্যালেনডুলা এত খাঁটি—এত সাদা।

ল্যানোলিন সমৃদ্ধ

খাঁটি সাদা

বোরো ক্যালেনডুলা*

অ্যান্টিসেপ্‌টিক ক্রীম

এর উৎকৃষ্ট উৎপাদন

Mileage/90/51

* প্রসাধন সামগ্রী নয়

ANANDAMELA 14 NOVEMBER 1990 REGD.NO.
WB/CC/264 MH BY SOUTH 683 TN/MS(C) 731

রিল্যাক্সনের স্ফূর্তি
অফুরন্ত প্রাণশক্তি

সারারাত রিল্যাক্সনের বিছানায় চমৎকার ঘুম।
তারফলে সারাদিন অফুরন্ত প্রাণশক্তিতে
শরীর-মন ভরপুর। রিল্যাক্সনের এইতো জাদু।
রিল্যাক্সন রাবারাইজ্‌ড কয়ার ম্যাট্রেস বিজ্ঞানসম্মত ভাবে
আপনার শরীরের ভার বহন করে।
এতে শুধু ঘুমই নয়, হয় সত্যিকারের বিশ্রাম।
রিল্যাক্সনের ছোঁয়ায় আপনার জীবন প্রাণবন্ত হোক।

RILAXON

আপনার আরামের জন্য

গদী • তাকিয়া • বালিশ

শ্রী দিগ্‌বিজয় সিমেন্ট কোম্পানী লিমিটেডের
'কয়ার ও ফেল্ট' ডিভিশন
১৪, নেতাজী সুভাষ রোড কলকাতা-৭০০ ০০১

ISI 8391-1977

Sobhagya/RIL-1/90/BEN